بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰہُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّۃٌ

খণ্ড- 11 / সংখ্যা-43-44

সাপ্তাহিক

বদর

কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

বাৎসরিক সাব্‌সক্রিপশন ৬০০ টাকা

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

www.akhbarbadr.in

বৃহস্পতিবার 22-29 Oct 2026 10-17 জামাদিউল আওয়াল 1448 A.H

মহান আল্লাহ্‌র বাণী
পুণ্যবানদের সাহচর্য অবলম্বনের আদেশ

وَاصۡبِرۡ نَفۡسَکَ مَعَ الَّذِیۡنَ یَدۡعُوۡنَ رَبَّہُمۡ بِالۡغَدٰوۃِ وَالۡعَشِیِّ یُرِیۡدُوۡنَ وَجۡہَہٗ ۫ وَلَا تَعۡدُ عَیۡنٰکَ عَنۡہُمۡ تُرِیۡدُ زِیۡنَۃَ الۡحَیٰوۃِ الدُّنۡیَا

অনুবাদ: এবং তুমি ধৈর্য সহকারে নিজেকে তাহাদের সহিত (সংযুক্ত) রাখ যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে তাঁহার সন্তোষ লাভের আশায় সকাল এবং সন্ধ্যায় ডাকে; এবং পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনায় তোমার চক্ষুদ্বয় যেন তাহাদিগকে পিছনে ফেলিয়া আগে বাড়িয়া না যায়। [আল কাহাফ, আয়াত: ২৯]

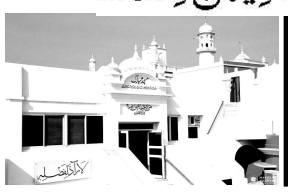


মহানবী (সা.)-এর বাণী
পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও অধ্যয়নের সভা

عَنۡ أَبِي هُرَيۡرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنۡهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا اجۡتَمَعَ قَوۡمٌ فِي بَيۡتٍ مِنۡ بُيُوتِ اللهِ، يَتۡلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيۡنَهُمۡ، إِلَّا نَزَلَتۡ عَلَيۡهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتۡهُمُ الرَّحۡمَةُ، وَحَفَّتۡهُمُ الۡمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنۡ عِنۡدَهُ

“যেসব মানুষ আল্লাহতালার ঘরসমূহের কোনো একটি ঘরে একত্রিত হয়, আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে এবং পরস্পরের মধ্যে তা শিক্ষা দেয় ও অধ্যয়ন করে, তাদের ওপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়, রহমত তাদের আচ্ছাদিত করে নেয়, ফেরেশতারা তাদের পরিবেষ্টন করে রাখেন এবং আল্লাহতালা তাঁর নিকটবর্তী ব্যক্তিদের মধ্যে তাদের কথা উল্লেখ করেন।”

(সহিহ মুসলিম, কিতাবুয যিকর ওয়াদ-দুআ ওয়াত-তাওবা ওয়াল-ইস্তিগফার, হাদিস নং ২৬৯৯)



হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী
ধর্মীয় সভা-সমাবেশে ঈমানের সুরক্ষা ও সত্য কথা বলার প্রয়োজনীয়তা

হজরত আকদাস মসিহে মওউদ (আ.) বলেন:

“আমাদের ধর্মীয় শিক্ষা তো এই যে, আর মুমিনের পদ্ধতিও এমনই হওয়া উচিত-কথা বললে স্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গভাবে বলবে, অন্যথায় নীরব থাকবে। যখনই দেখবে, কোনো সভায় আল্লাহতালা ও তাঁর রসুলকে নিয়ে হাসি-তামাশা করা হচ্ছে, তখন হয় সেখান থেকে চলে যাবে, যাতে তাদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য না হও; অথবা সেখানে থেকে সম্পূর্ণ স্পষ্টভাবে তার জবাব দেবে। দুটি বিষয়ই রয়েছে-হয় জবাব দেওয়া, নয়তো নীরব থাকা। তৃতীয় যে পদ্ধতি, তা হলো মুনাফিকি; অর্থাৎ সভায় বসে থাকা এবং তাদের কথায় সায় দিয়ে যাওয়া, আর নিচু স্বরে, গোপনে নিজের বিশ্বাস প্রকাশ করা।” (মালফুজাত, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৪৪৯; বদর, ১৪ মার্চ ১৯০৮)

ফাজায়েলুল কুরআনের উদ্ধৃতি
দ্বীনি মজলিসের গুরুত্ব

হজরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন:

“আমার দুঃখ হয় যে, কোনো কোনো বন্ধু, যদিও তাঁদের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য, বারবার বোঝানো সত্ত্বেও সভা থেকে উঠে চলে যান এবং বাইরে ঘোরাফেরা করতে থাকেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, প্রত্যেক জামাতেই কিছু লোক এমন থাকেন, যাঁরা কেবল লোকদেখানোর জন্য সদস্য হন। তাঁরা সভায় নিজেদের উপস্থিতি প্রদর্শন করার পর স্থান ত্যাগ করে চলে যান।

পবিত্র কুরআনেও উল্লেখ রয়েছে যে, মহানবী (সা.)-এর সময়েও এমন লোক ছিল, যারা লোকদেখানোর জন্য আসত। যখন সভা অনুষ্ঠিত হতো, তখন তারাও সেখানে এসে উপস্থিত হতো। আলোচনা শুরু হওয়ার আগে প্রত্যেকের ওপরই দৃষ্টি পড়ত। সাহাবিরা তাদের দেখতেন; কিন্তু যখন কার্যক্রম শুরু হয়ে যেত, তখন তারা চোখের আড়ালে সরে পড়তে শুরু করত। এ ধরনের লোকদের সম্পর্কে আল্লাহতালা বলেন: قَدۡ يَعۡلَمُ اللّٰهُ الَّذِيۡنَ يَتَسَلَّلُوۡنَ مِنۡكُمۡ لِوَاذًا

‘আল্লাহ তাদের ভালোভাবেই জানেন, যারা তোমাদের মধ্য থেকে চোখ বাঁচিয়ে সরে পড়ে।’ (সূরা আন-নূর)

এখানেও এমন লোকদেখানো সদস্য থাকতে পারেন। তবে অনেকেই আছেন, যাঁরা এই বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করেন না এবং জানেন না যে, তাঁদের এই কাজ কতটা গুরুতর।

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার মহানবী (সা.) ভাষণ দিচ্ছিলেন। এমন সময় তিনি বললেন, আল্লাহতালা আমাকে জানিয়েছেন যে, এই সভায় একজন ব্যক্তি এসেছিলেন। তিনি দেখলেন, সভাটি পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। তাঁর কাছে কণ্ঠস্বর পৌঁছানোও কঠিন ছিল। কিন্তু তিনি এই চিন্তা করে যে, এখানে আল্লাহর স্মরণ হচ্ছে, তাই এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত নয়, লজ্জাবোধ করে সেখানেই বসে রইলেন। আল্লাহতালা বললেন, আমিও তার পাপসমূহের ব্যাপারে লজ্জাবোধ করব এবং সেগুলোর জন্য তাকে পাকড়াও করব না।

এরপর আরেকজন ব্যক্তি এলেন। তিনিও দেখলেন যে, সভায় বসার কোনো জায়গা নেই। কিন্তু তিনি এদিক-ওদিক খুঁজে এমন একটি জায়গায় বসলেন, যেখান থেকে তিনি কণ্ঠস্বর শুনতে পারবেন। আল্লাহতালা বললেন, এই ব্যক্তি যেমন চেষ্টা করে সামনে এগিয়ে বসার ব্যবস্থা করেছে, তেমনি আমিও তাকে আমার নৈকট্যে স্থান দেব।

এরপর তৃতীয় একজন ব্যক্তির বিষয়ে আল্লাহতালা সংবাদ দিলেন। সে এল, কিন্তু কণ্ঠস্বর তার কাছে পৌঁছাবে না দেখে ফিরে চলে গেল। আল্লাহতালা বললেন, এই ব্যক্তি যেমন আল্লাহর স্মরণের সভা থেকে ফিরে চলে গেল, তেমনি আমিও তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেব এবং তার জন্য রহমতের দরজাগুলো খুলব না।”

(ফাযায়েলে কুরআন, পৃষ্ঠা ২৬৪-২৬৫)

‘পবিত্র কুরআন’ এক চিরন্তন আত্মিক আহার’

“সব সময় মনে রেখো- ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের মূল ও শ্রেষ্ঠ উপায় হল, পবিত্র কুরআনের অধ্যয়ন। আমাদের শরীর টিকে থাকার জন্য যেমন খাদ্য ও পানির প্রয়োজন হয়, তেমনই আত্মিক জীবনের পুষ্টির জন্য আল্লাহ্ তা’লা তাঁর প্রেরিত নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাধ্যমে আমাদের দান করেছেন এক চিরন্তন আত্মিক আহার- ‘পবিত্র কুরআন’। ... অতএব অশালীন চলচ্চিত্র বা অনুষ্ঠান দেখে কিংবা ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অমূল্য সময় অপচয় না করে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কর- তোমরা পবিত্র কুরআন ও এর শিক্ষার জ্ঞান অর্জনে নিজেকে নিয়োজিত করবে। কুরআনকে তোমাদের আত্মশুদ্ধি, চরিত্রগঠন ও আল্লাহ্ তা’লার নৈকট্য লাভের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করবে। এ কুরআনই তোমাদেরকে সমাজে কল্যাণকর ও ইতিবাচক ভূমিকা পালনের পথে পরিচালিত করবে। তাই কুরআনের প্রতিটি আয়াত গভীর মনোযোগসহকারে পাঠ কর, হৃদয়ে ধারণ এবং শ্রদ্ধার সাথে মূল্য দাও।

(ন্যাশনাল ইজতেমা, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ইউকে, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

সম্পাদকীয়

হজরত খলিফাতুল মসীহ আল খামিস আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আযীয-এর যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসা ২০২৬-এর সমাপনী ভাষণের সারসংক্ষেপ

তাশাহহুদ, তা'আউয ও সূরা ফাতিহা তিলাওয়াতের পর তিনি বলেন:

আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করে এমন এক যুগে জন্মগ্রহণের সুযোগ দিয়েছেন, যখন মহানবী (সা.)-এর সত্যনিষ্ঠ গোলাম মসীহ ও মাহদীকে ইসলাম ধর্মের শিক্ষা পৃথিবীতে প্রচার করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। এই আগমনকারী মসীহ ও মাহদীকে তাঁর সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মাধ্যমে এমন একটি জামাত প্রতিষ্ঠা করতে হতো, যার প্রত্যেক সদস্য হবে একনিষ্ঠ একত্ববাদী এবং শিরকের অবসান ঘটানোর জন্য শুধু নিজের ব্যক্তিগত জীবনেই প্রচেষ্টা চালাবে না, বরং সমগ্র বিশ্বকে এক আল্লাহ্‌র পতাকাতলে সমবেত করার জন্যও সচেষ্ট থাকবে।

অতএব, হজরত মসীহে মওউদ (আ.) এই উদ্দেশ্যে একটি পবিত্র জামাত প্রতিষ্ঠা করেন এবং দশটি শর্তের ভিত্তিতে তাঁর অনুসারীদের কাছ থেকে বাইআত গ্রহণ করেন। জামাতে প্রবেশ করার সময় আমরা বাইআতের সেই বাক্যগুলোই পুনরাবৃত্তি করি।

তিনি যে বাইআত গ্রহণ করেছিলেন, তা ছিল এই অঙ্গীকারগুলোর ভিত্তিতে যে, যত দিন না আমি কবরে প্রবেশ করছি, তত দিন শিরকের কাছেও যাব না। মিথ্যা, ব্যভিচার, কুদৃষ্টি, পাপাচার ও অনাচার, অত্যাচার, বিশ্বাসভঙ্গ, বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহ থেকে বিরত থাকব। প্রবৃত্তির তাড়না ও উত্তেজনার সময় সেগুলোর কাছে পরাভূত হব না। আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য শুধু পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের পাবন্দ থাকব না, বরং তাহাজ্জুদের নামাজও আদায় করার চেষ্টা করব। মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরুদ পাঠ করব এবং প্রতিদিন নিজের পাপের ক্ষমা প্রার্থনা করব। আল্লাহ্‌তা'লার অনুগ্রহসমূহ স্মরণ রাখব এবং সর্বদা তাঁর প্রশংসা করতে থাকব। সাধারণভাবে আল্লাহ্‌তা'লার সৃষ্টির প্রতি এবং বিশেষভাবে মুসলমানদের প্রতি প্রবৃত্তির তাড়নার বশবর্তী হয়ে কোনো প্রকার কষ্টের কারণ হব না। কুসংস্কার, অনৈতিক প্রথা ও প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা থেকে বিরত থাকব। অহংকার পরিহার করব এবং বিনয়, সদাচরণ, নম্রতা ও দীনতা অবলম্বন করব। ধর্মের মর্যাদা রক্ষা করা এবং ইসলামের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করাকে নিজের জীবন, সম্পদ, সম্মান ও সন্তানসন্ততির চেয়েও বেশি প্রিয় মনে করব। হজরত মসীহে মওউদ (আ.) যে সিদ্ধান্তই গ্রহণ করবেন, তা অন্তর থেকে মেনে নেব।

হুজুরে আনওয়ার, আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলা বলেন:

এখানে খিলাফতের প্রতিও পূর্ণ আনুগত্যের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কারণ, খিলাফতও আল্লাহ্‌?তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুসারে হজরত মসীহে মওউদ (আ.)-এর কার্যাবলিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই প্রতিষ্ঠিত।

হুজুরে আনওয়ার, আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলা বলেন, এই বিষয়টি আমি আগেও বর্ণনা করেছি এবং তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিতও হয়েছে। কিন্তু বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে আজ আমি আবারও এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব।

বাইআতের প্রথম শর্তে শিরক থেকে বিরত থাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হজরত মসীহে মওউদ (আ.) বলেন, মানুষের সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো, সে যেন আল্লাহ্‌র জন্য নিবেদিত হয়ে যায়। পাপ অনেক রকমের এবং এর বহু শাখা-প্রশাখা রয়েছে কিন্তু সবচেয়ে ভয়াবহ পাপ হলো শিরক। দুর্ভাগা মানুষ যত বেশি এতে লিপ্ত হয়, তত বেশি সে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। পরিশেষে অধঃপতিত হতে হতে এমন এক নিম্নস্থানে গিয়ে পতিত হয়, যা বিপদাপদ, দুঃখ-কষ্ট এবং সব ধরনের দুর্ভোগের আবাসস্থল; একেই জাহান্নামও বলা হয়।

মহানবী (সা.)-ও যখন বাইআত গ্রহণ করতেন, তখন সম্পূর্ণরূপে শিরক থেকে বিরত থাকার অঙ্গীকার গ্রহণ করতেন। অতএব, আমাদের সর্বদা চেষ্টা করা উচিত, যেন আমরা কখনো এমন কোনো কাজ না করি, যা আমাদের বাইআতের অঙ্গীকার থেকে বিচ্যুত করে।

হজরত মসীহে মওউদ (আ.) বলেন, সব ধরনের শিরক থেকে বিরত থাকতে হবে। সূর্য নয়, চন্দ্র নয়, আকাশের নক্ষত্ররাজি নয়, বায়ু নয়, আগুন নয়, পানি নয়, এমনকি পৃথিবীর অন্য কোনো বস্তুকেও উপাস্য বলে গণ্য করা যাবে না। তদ্রূপ পার্থিব উপায়-উপকরণকে এমন মর্যাদা দেওয়া এবং সেগুলোর ওপর এমন নির্ভর করা যাবে না, যেন সেগুলো আল্লাহ্‌র অংশীদার। এমনকি নিজের শক্তি ও প্রচেষ্টাকেও এমন কিছু মনে করা উচিত নয়, কারণ এটিও শিরকের এক প্রকার।

শিরককে খণ্ডন করার প্রসঙ্গে সূরা ইখলাস সম্পর্কে হজরত মসীহে মওউদ (আ.) বলেন, এটি একটি ছোট্ট সূরা, অথচ অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও মনোরম উপায়ে এটি মানুষকে সব ধরনের শিরক থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে এবং আল্লাহ্‌তা'লার পবিত্র সৌন্দর্যকে যাবতীয় অপূর্ণতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র বলে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

মহানবী (সা.)-এর পুত্র হজরত ইবরাহিম (রা.) যখন ইন্তেকাল করেন, তখন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। লোকেরা বলেছিল, হজরত ইবরাহিমের ইন্তেকালের কারণেই সূর্যগ্রহণ হয়েছে। কিন্তু রসুলুল্লাহ (সা.) বলেছিলেন, নিশ্চয়ই সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ্‌তা'লার নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কারও জীবন বা মৃত্যুর কারণে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না।

এক স্থানে তিনি (আ.) বলেন:

শিরক তিন প্রকারের। প্রথমত, সাধারণভাবে মূর্তিপূজা করা। দ্বিতীয় প্রকার হলো, পার্থিব উপায়-উপকরণের ওপর সীমাতিরিক্ত নির্ভর করা। তৃতীয় প্রকার শিরক হলো, আল্লাহ্‌তা'লার অস্তিত্বের সামনে নিজের অস্তিত্বকেও কোনো কিছু বলে মনে করা।

বস্তুগত উন্নতির এই যুগে উপায়-উপকরণের ওপর নির্ভরতার মাধ্যমে সংঘটিত শিরক ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি বলেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' হলো তাওহিদের বাণী। এর অর্থ হলো, আল্লাহ্‌?তা'লা ছাড়া আর কেউই ইবাদত ও প্রকৃত আনুগত্য লাভের যোগ্য নয়। মহানবী (সা.) আল্লাহ্‌র কাছ থেকে সেই নির্দেশনাবলি লাভ করে সৃষ্টির কাছে পৌঁছে দেন। আর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যা কিছু আসে, তা এই পথেই আসে।

হুজুরে আনওয়ার বলেন, আমাদের সর্বদা চেষ্টা করা উচিত, যেন প্রতিটি কাজ করার সময় এবং প্রতিটি কথা বলার সময় আমাদের মনে এই সচেতনতা থাকে যে, আমাদের বলা কোনো কথা যেন আমাদের আল্লাহ্‌?র কাছ থেকে দূরে সরিয়ে না দেয় এবং শয়তানের নিকটবর্তী না করে।

হজরত মসীহে মওউদ (আ.)-এর সঙ্গে আল্লাহ্‌তা'লার প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, তিনি তাঁকে বিজয় দান করবেন এবং অবশ্যই করবেন। কিন্তু আমাদেরও কর্তব্য, যদি আমরা সেই বিজয়সমূহের অংশীদার হতে চাই, তাহলে যেন আমরা বিশুদ্ধচিত্তে আল্লাহ্‌?তা'লার একত্বের ঘোষণা প্রদানকারী হয়ে উঠি।

হজরত মুসলে মওউদ (রা.) বলেন:

"হে আহমদী জাতি! আল্লাহ্‌ আমাদের কোনো আত্মীয় নন। শিরক থেকে বিরত থাকো এবং ইবাদত করো, তাহলে আল্লাহ্‌ তোমাদের অভিভাবক হয়ে যাবেন। দেখো! আল্লাহ্‌? হজরত নূহ (আ.)-এর পুত্রের প্রতিও কোনো পরোয়া করেননি। বরং এমন কাজ করো, যাতে তোমরা আহমদী হওয়ার যোগ্য বলে প্রমাণিত হতে পারো।"

হজরত লোকমান (আ.)-ও তাঁর পুত্রকে প্রচ্ছন্ন শিরক থেকে বেঁচে থাকার উপদেশ দিয়েছিলেন। হুজুরে আনওয়ার মুসলমানদের বাস্তব অবস্থা উল্লেখ করে বলেন, তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করে ঠিকই, কিন্তু শিরকের বিভিন্ন অবস্থায় নিমজ্জিত রয়েছে।

শিরকের একটি প্রকার হলো মিথ্যার ব্যবহার। আজ মানুষ মনে করে, মিথ্যা ছাড়া চলা সম্ভব নয়। হুজুরে আনওয়ার হজরত মসীহে মওউদ (আ.)-এর ডাকঘর-সংক্রান্ত মামলার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। এ প্রসঙ্গে হজরত মসীহে মওউদ (আ.) বলেছেন, মানুষ মনে করে, সত্য কথা বলে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়; কিন্তু আমি সত্য বলেছিলাম এবং আল্লাহ্‌ আমাকে রক্ষা করেছিলেন।

হুজুরে আনওয়ার বলেন, আজকাল এমন অনেক ঘটনা সামনে আসে, যেখানে মিথ্যা বলা হয়ে থাকে। আমাদের অবশ্যই এ থেকে বিরত থাকতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, মিথ্যা মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতির পরিপন্থী। কিন্তু বর্তমান বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকে বোঝা যায়, কীভাবে নানা উপায়ে মিথ্যা বলা হচ্ছে। একের পর এক দেশ একত্রিত হয়ে অন্য দেশের বিরুদ্ধে মিথ্যার ওপর ভিত্তি করে আক্রমণ চালাচ্ছে।

অতএব, আজ যদি আমরা আমাদের বাইআতের অঙ্গীকারের যথার্থ অধিকার আদায় করতে চাই এবং পৃথিবীতে বিপ্লব আনতে চাই, তাহলে আহমদীদের দায়িত্ব হলো, তারা যেন মিথ্যার বিরুদ্ধে জিহাদ করেন।

এরপর আরেকটি মন্দ কাজ হলো কুদৃষ্টি। হজরত মসীহে মওউদ (আ.) বলেন, "যদি আমার হাতে বাইআত করে থাকো, তাহলে কাউকে অসৎ দৃষ্টিতে দেখবে না। কুদৃষ্টি থেকে বিরত থাকবে।" পবিত্র কুরআনের শিক্ষা খ্রিষ্টানদের শিক্ষার মতো নয় যে, শুধু কুদৃষ্টিতে নারীর দিকে তাকাতে নিষেধ করে। বরং পবিত্র কুরআন নির্দেশ দেয়, কামনার দৃষ্টিতে কিংবা কামনা ছাড়াও পরনারীর মুখের দিকে তাকাবে না। অনুরূপভাবে, তাদের এমন কথাবার্তাও শুনবে না, যা কোমলতা ও মধুরতার আড়ালে মানুষের চিন্তাভাবনাকে ভুল পথে পরিচালিত করে। কেবল এভাবেই তোমরা পদস্খলন থেকে রক্ষা পেতে পারবে।

হুজুরে আনওয়ার বলেন, বর্তমান সমাজে এই মন্দ কাজগুলোই ব্যাপকভাবে বিদ্যমান, যার ফলে অনেক মানুষ নানা পাপে জড়িয়ে পড়ে এবং সংসারও ভেঙে যায়। বর্তমানে উন্নত দেশগুলোর শিক্ষিত নারীদের মধ্যেও এ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে এবং তাঁরাও সোচ্চার হয়ে বলছেন যে, তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার জন্য আইন প্রণয়ন করা উচিত। অতএব, আহমদীদের কর্তব্য হলো, এসব মন্দ কাজের বিরুদ্ধে জিহাদ করা।

হজরত মসীহে মওউদ (আ.) বলেন, পবিত্র ও নিষ্কলুষ জীবনযাপনের জন্য পাঁচটি বিষয় রয়েছে।

প্রথমত, নিজের চোখকে পরনারীর দিকে তাকানো থেকে রক্ষা করো।

শেষাংশ ১৬ পাতায়....



জুমআর খুতবা

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষেত্রে আমাদের প্রিয় নেতা হজরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র বাস্তব আদর্শ।

"সর্বপ্রথম আমার হৃদয়ে আল্লাহ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা উপচে পড়ে, যিনি আমার জামাতকে আন্তরিক নিষ্ঠা, ভালোবাসা ও সহানুভূতি দান করেছেন।

আল্লাহ তা'লার অনুগ্রহ যদি তাঁদের সঙ্গে না থাকত, তাহলে তাঁদের কখনোই এমন তাওফিক দেওয়া হতো না যে, তাঁরা সাহাবিগণের (রা.) পদাঙ্ক অনুসরণ করে এমন উচ্চমানের আনুগত্য প্রদর্শন করবেন এবং নিজেদের আর্থিক সংকট ও স্বল্প আয় থাকা সত্ত্বেও নিজেদের সামর্থ্যের অতিরিক্ত আর্থিক সেবায় নিয়োজিত হবেন। আমি দোয়া করি, আল্লাহ তা'লা তাঁদের সবার ধনসম্পদে বরকত দান করুন এবং ধর্মীয় উদ্দেশ্যাবলি পূরণের জন্য তাঁরা যে সাহায্য ও সহযোগিতা করে যাচ্ছেন, আল্লাহ তা'লা যেন তা উভয় জগতে তাঁদের কল্যাণের কারণ করে দেন।" (হজরত মসীহ মওউদ (আ.))

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পতাকা পৃথিবীতে উড্ডীন রাখার জন্য হজরত মসীহ মওউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সাল্লাম যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন, তা সুস্পষ্ট। কিন্তু তিনি তাঁর সেইসব সাহায্যকারীর প্রতিও অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকতেন, যাঁরা তাঁর এই মহান মিশন পূর্ণ করার জন্য যেকোনোভাবে সাহায্য করেছিলেন।

হজরত মসীহ মওউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সাল্লামের প্রতি কেউ সামান্যতম সেবা করলেও তিনি তার জন্য অপরিসীম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন।

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ২৮ আগস্ট, ২০২৬, এর জুমুআর খুতবা (২৮ জহুর, ১৪০৫ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর পতাকাকে সারা বিশ্বে উড্ডীন করার জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যে সকল প্রচেষ্টা করেছেন তা তো সুস্পষ্ট, কিন্তু তিনি তাঁর সেই সকল সাহায্যকারীদের প্রতিও অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকতেন যারা তাঁর এই মিশনকে পূর্ণ করার জন্য যেকোনো ভাবে সাহায্য করেছেন।

অতএব হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.) ৪ অক্টোবর ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের এক ইশতাহারে একটি আহ্বান জানান, যাতে তিনি আর্থিক সাহায্য প্রদানকারী জামাতের নিষ্ঠাবান সদস্যদের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এটি খোদা তা'লার রীতি যে, আল্লাহ্?ওয়ালাদের প্রত্যেকটি দলেরই তাদের প্রাথমিক অবস্থায় চাঁদার প্রয়োজন হয়। আমাদের নবী (সা.)-ও বহুবার সাহাবীদের (রা.) ওপর চাঁদা ধার্য করেছেন, যার মধ্যে হযরত আবূ বকর (রা.) সবচেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। সুতরাং, সাহসিকতার সাথে সাহায্যার্থে কালবিলম্ব না করে পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। প্রত্যেকে যেন নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী (সাহায্য করে)। সে সময় তিনি (আ.) লঙ্গরখানার জন্য এই আহ্বান জানিয়েছিলেন, কেননা এটিও একটি উদ্দেশ্য ছিল যে, মেহমানরা আসত যেন তারা ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং তাঁর (আ.) দাবি সম্পর্কে জানতে পারে। তিনি বলেছিলেন যে, নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী এই লঙ্গরখানার জন্য সাহায্য করুন। আমি চাই, যদি সম্ভব হয় তবে এমন একটি ব্যবস্থা প্রবর্তিত হোক যাতে আমরা লঙ্গরখানার মাথাব্যথা থেকে মুক্ত হয়ে নিশ্চিন্তে আমাদের কাজে লিপ্ত থাকতে পারি। অর্থাৎ, তাঁর (আ.) ইসলাম প্রচারের যে কাজ ছিল, মহানবী (সা.)-এর বাণীকে সারা বিশ্বে পৌঁছে দেওয়ার যে কাজ ছিল, সেদিকে মনোযোগ যেন আরও বৃদ্ধি পায় এবং যে মেহমানরা এই উদ্দেশ্যে আসেন, তাদের জন্য তিনি একটি পৃথক ব্যবস্থা করতে চাইতেন। যাই হোক, তিনি বলেন যে, নিশ্চিন্তে আমরা যেন কাজে লিপ্ত থাকতে পারি এবং আমাদের সময়ের যেন কোনো ক্ষতি না হয়। আর যারা আমাদের সাহায্য করে, তারা পরিশেষে খোদার সাহায্য দেখতে পাবে।"

এরপর তিনি আরও বলেন যে, "আমি এই কথাটি না লিখে থাকতে পারছি না যে, এই সাহায্য এবং প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় প্রথম স্থানে রয়েছেন আমাদের একনিষ্ঠ, আল্লাহর খাতিরে আমার প্রিয় মৌলবী হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব (রা.), যিনি শুধু আর্থিক সাহায্যই করেননি বরং জাগতিক সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে, ফকিরের বেশ ধারণ করে এবং নিজ মাতৃভূমি থেকে হিজরত করে কাদিয়ানে আমৃত্যু অবস্থান গ্রহণ করেছেন এবং সব সময় উপস্থিত থাকেন। আমি যদি চাই তবে তাকে পূর্বে পাঠিয়ে দিতে পারি অথবা পশ্চিমে পাঠিয়ে দিতে পারি, অর্থাৎ ইসলামের বাণী পৌঁছে দেওয়ার জন্য। আমার দৃষ্টিতে এরা সেই সকল মানুষ, যাদের ব্যাপারে 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থে এই ইলহাম রয়েছে যে: اَصْحَابُ الصُّفَّةِ وَمَا اَدْرٰكَ مَا اَصْحَابُ الصُّفَّةِ অর্থাৎ তারা হলো সুফফার অধিবাসী, আর তুমি কি জানো যে সুফফার অধিবাসী কারা?

এরপর তিনি বলেন যে, তাঁর পর দ্বিতীয় স্তরে রয়েছেন আল্লাহর খাতিরে আমার প্রিয় মৌলবী আব্দুল করীম শিয়ালকোটী সাহেব (রা.)। আর তাঁকে তো খোদা তা'লা আগে থেকেই জাগতিক পদমর্যাদা ও খ্যাতি লাভের স্পৃহা প্রদান করেননি, তবে এখন তিনি পুরোপুরি পার্থিব চিন্তাভাবনা থেকেও ইস্তফা দিয়ে এই দ্বারে এসে বসেছেন এবং দিনরাত নিজের মেধাকে সাধ্যাতীতভাবে কাজে লাগিয়ে ধর্মের সেবা করে যাচ্ছেন। আর জুমুআর নামাযে তিনি কুরআন শরীফের বহু সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও জ্ঞান বর্ণনা করেন এবং মুসলমানদের উপকৃত করেন। এছাড়া মৌলবী হাকীম নূরুদ্দীন সাহেবের (রা.) শহরের বাসিন্দা হাকীম ফযল দীন সাহেবও (রা.) রয়েছেন এবং তিনিও প্রায় একই জায়গায় বসবাস করছেন ও সেবায় নিয়োজিত আছেন। আর আমাদের এক নিষ্ঠাবান বন্ধু ডাক্তার বুঢ়ে খান সাহেব (রা.) পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন, কিন্তু এটি কৃতজ্ঞতার বিষয় যে, আরও চারজন নিষ্ঠাবান ডাক্তার অর্থাৎ খলীফা রশীদউদ্দীন সাহেব লাহোরী (রা.), ডাক্তার মির্যা ইয়াকুব বেগ সাহেব কালানৌরী, ডাক্তার মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব এবং ডাক্তার আব্দুল হাকীম খান সাহেব আমাদের জামাতে বিদ্যমান রয়েছেন। একইভাবে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এমন কিছু সুহৃদও রয়েছেন যারা এখানে বসবাস শুরু করেছেন, তাদের মধ্যে মির্যা খোদা বখশ সাহেবও (রা.) রয়েছেন এবং সেইসাথে সাহেবযাদা সিরাজুল হক সাহেব সিরসাবী (রা.) নিজ মাতৃভূমি সিরসাওয়া থেকে হিজরত করে কাদিয়ানে চলে এসেছেন, এছাড়াও আরও অনেক বন্ধু রয়েছেন এবং আমরা দোয়া করি যেন এই সকল বন্ধুদের জন্য এসব হিজরত মোবারক হয়।

আর মৌলবী হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব (রা.) তো আমাদের এই জামাতের এক উজ্জ্বল প্রদীপ। তিনি প্রতিদিন কুরআন শরীফ ও হাদিসের দরস দেন এবং কুরআন শরীফের এত সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও জ্ঞান বর্ণনা করেন যে, এটি যদি খোদার সাহায্য না হয়, তবে আর কী? হযরত মৌলবী সাহেব (রা.) এবং আল্লাহর খাতিরে আমার প্রিয় মৌলবী আব্দুল করীম (রা.) উভয়েই আন্তরিক সততার সাথে চান যে, কাদিয়ানেই যেন তাদের জীবন অতিবাহিত হয় এবং কাদিয়ানেই যেন তাদের মৃত্যু হয়। আর আমাদের জামাতের ঐ নিষ্ঠাবান দল যারা ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত আছেন, তাদের মাঝে আল্লাহর খাতিরে আমার প্রিয় মাদ্রাজের ব্যবসায়ী শেঠ আব্দুর রহমান সাহেব (রা.) প্রশংসার দাবিদার এবং তিনি সওয়াবের অনেক সুযোগ লাভ করেছেন। তিনি এতটা উৎসাহী প্রেমিক যে, এত দূরে থেকেও তিনি নিকটে অবস্থান করছেন এবং আমাদেও জামাতের লঙ্গরখানায় অনেক সাহায্য করে থাকেন। তাঁর সততা এবং তাঁর ধারাবাহিক সেবাসমূহ যা ভালোবাসা, বিশ্বাস ও দৃঢ় প্রত্যয়ে পরিপূর্ণ, তা সমগ্র জামাতের সামর্থ্যবান লোকদের জন্য এক আদর্শস্বরূপ, কেননা এমন লোক খুবই কমই

আছেন। তিনি প্রতি মাসে নিয়মিত একশত রুপি পাঠান এবং আজ পর্যন্ত বহুবার নিছক নিজের ভালোবাসা ও নিষ্ঠার প্রবল আবেগে পাঁচশত টাকা পর্যন্ত পাঠিয়েছেন। সেই যুগে এটি একটি অনেক বড় অঙ্কের অর্থ ছিল, যা তিনি ধর্মপ্রচারের জন্য এবং মেহমানদের দেখাশোনার জন্য পাঠাতেন, আর মাসিক যে একশত টাকা, সেটি এর অতিরিক্ত। একইভাবে আল্লাহর খাতিরে আমার প্রিয় লাহোরের ব্যবসায়ী শেখ রহমতুল্লাহ সাহেব, অর্থাৎ লাহোরের শেঠ সাহেব রয়েছেন। আমি খুব ভালোভাবে জানি যে, উল্লিখিত শেখ সাহেব মন ও প্রাণ দিয়ে আমাদের ভালোবাসেন, এবং আমার ওপর দায়ের করা ফৌজদারি মামলাগুলোতে তিনি নিজের অনেক অর্থ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন এবং ভালোবাসার প্রবল আবেগে পাগলের মতো দিকভ্রান্ত হয়ে আমার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করতে থেকেছেন। এখন তিনি আমাদের কাজের জন্য শত শত টাকা খরচ করে লন্ডনে অবস্থান করছেন, খোদা তা'লা তাঁকে খুব শীঘ্রই নিরাপদে ও সুস্থতার সাথে ফিরিয়ে আনুন। এটি সেই সময়ের কথা, যখন তিনি লন্ডনে গিয়েছিলেন। তিনি (আ.) বলেন, এটিও উল্লেখ করার মতো বিষয় যে, আল্লাহর খাতিরে আমার প্রিয় সরদার নবাব মুহাম্মদ আলী খান সাহেবও (রা.) ভালোবাসা এবং নিষ্ঠায় অনেক উন্নতি করেছেন এবং সঠিক প্রজ্ঞা সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি খুব শীঘ্রই ঈর্ষণীয় নিষ্ঠা ও ভালোবাসার মিনারে পৌঁছবেন। আর তিনি সর্বদা সাধ্যমতো আর্থিক সাহায্যের ক্ষেত্রেও সহায়তা করেছেন এবং আশা করা যায় যে, তিনি এর চেয়েও বেশি খোদার পথে নিজের ধন-সম্পদ উৎসর্গ করবেন। খোদা তা'লা প্রত্যেকের আমল দেখেন এবং তিনি বলেন যে, আমার বলার এবং লেখার প্রয়োজন নেই। একইভাবে তিনি বলেন, আরও অনেক নিষ্ঠাবান রয়েছেন, কিন্তু আক্ষেপ যে, আমি যদি নাম লিখি, তবে তিনি যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, তা অনেক বড় একটি প্রবন্ধে পরিণত হবে। তাদের সবার জন্য আমি দোয়া করি, খোদা যেন তাদের উভয় জগতের আনন্দ দান করেন। তারা খোদার জন্য যা কিছু করেন বা ভবিষ্যতে করবেন, তা সবই খোদা তা'লার দৃষ্টিতে রয়েছে।" [মাজমুয়ায়ে ইশতেহরাত, ২য় খণ্ড, পৃ:৫৪২-৫৪৬]

এগুলো ছিল মহানবী (সা.)-এর সত্যনিষ্ঠ দাসের নিজের সাহায্যকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পদ্ধতি। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কারও কোনো সামান্য সেবা হলেও তার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন। অতএব হযরত মুনশী মেহবুব আলম সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমাদের মহল্লায় এক অ-আহমদী ছিল, যে ফালুদা বানাতো। হযরত সাহেব (আ.) যখন খাজা কামালউদ্দীন সাহেবের বাড়িতে আগমন করেন, তখন সেই ফালুদা প্রস্তুতকারক আমাকে বলে, আপনি যদি হুযূরের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে দেন, তাহলে আমি হুযূরকে ফালুদা খাওয়াতে চাই। সেমতে, তিনি হযরত আকদাস (আ.)-এর সমীপে নিবেদন করেন। হুযূর আমার আবেদন মঞ্জুর করেন। অতএব, সে সব সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে সেখানে চলে আসে। হযরত সাহেব (আ.) খাজা কামাল উদ্দীনের উঠানে একটি খাটের ওপর উপবিষ্ট ছিলেন। আমি তাকে পেশ করি, [হযরত মসীহ মওউদ (আ.)- কে আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল,] তিনি তাকে ফালুদা বানাতে বলেন। এরপর সে বাইরে বসে যায় এবং এক পেয়ালা ফালুদা বানিয়ে হুযূরের সমীপে পেশ করে। হুযূর তা পান করেন এবং পছন্দ হওয়ার কথা জানিয়ে বলেন, খুবই ভালো হয়েছে। এরপর সে আরও দশ-বারোটি পেয়ালা ভেতরে পাঠায় এবং সবাইকে পান করায়। তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দুই রুপি বের করে আমাকে দেন। [সে যুগে এর অনেক মূল্য ছিল] আমি যেন তা তাকে দিয়ে দিই। আমি সেই দুই রুপি নিয়ে তার কাছে যাই, (কিন্তু) সে তা নিতে অস্বীকার করে এবং আমাকে বলে, আমাকে হযরত সাহেবের সমীপে নিয়ে চলুন। কাজেই, আমি তাকে হযরতের সমীপে নিয়ে যাই। সে হযরত সাহেব (আ.)-এর সামনে হাত জোড় করে বলে, আমার দুই রুপির প্রয়োজন নেই। আমি হাদিয়া হিসেবে ফালুদা পেশ করেছিলাম। তার পীড়াপীড়িতে হযরত সাহেব তাকে আর সেই রুপি দেননি বটে, কিন্তু তার জন্য দোয়া করেন এবং 'জাযাকুমুল্লাহু আহসানাল জাযা' বলেন। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, সেই লোকের জন্য দোয়ার কল্যাণেই তার সন্তানেরা খুব ভালো ভালো পদে অধিষ্ঠিত রয়েছে। [আসহাবে আহমদ, ৪র্থ খণ্ড-২৭৮-২৭৯]

হযরত মৌলভী ইবরাহীম সাহেব বাকাপুরী (রা.) বর্ণনা করেন, একবার শিয়ালকোট জামা'ত, যাদের মধ্যে মরহুম হযরত মীর হামিদ শাহ সাহেব (রা.), মরহুম চৌধুরী নসরুল্লাহ্ খান সাহেব (রা.) এবং এই অধমও অন্তর্ভুক্ত ছিল, হাদিয়া বা উপহারস্বরূপ হুযূরের সমীপে কিছু রুপি পেশ করে। হুযূর (আ.) সেই রুমালটি নেন যাতে রুপিগুলো বাঁধা ছিল, এবং প্রথমে 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলেন, তারপর বলেন 'জাযাকুমুল্লাহ্'। এতে আমাদের ঈমানে এক প্রকার উন্নতি সাধিত হয় যে, হুযূর প্রথমে খোদার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, এরপর আমাদের জন্য দোয়া করেছেন। [আসহাবে আহমদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫৬]

আগেও একবার আমি বর্ণনা করেছি, হুযূর (আ.) বলেছেন, প্রথমে আল্লাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, তারপর বান্দাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। [হায়াতে কুদসি, পৃ: ১৩৪]

একটি ঘটনা হযরত যুলফিকার আলী খান গওহর সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একবার হুযূর (আ.) নিচের তলায় অবস্থিত বায়তুদ্ দোয়া থেকে, মেহেদি লাগানোর কারণে প্রায় দশটার দিকে বের হন। বায়তুদ দোয়া সংলগ্ন একটি ছোট্ট কক্ষ ছিল। [দাড়ি এবং মাথার চুলে রং লাগিয়েছিলেন, খেযাব লাগিয়েছিলেন, সে যুগে মেহেদি লাগানো হতো, তাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তা লাগাতেন। তিনি বলেন, তা লাগানো ছিল, তিনি (আ.) বাইরে আসেন,] উঠানের দিকে যার একটি দরজা খুলত এবং আরেকটি আমার কক্ষের দিকে ছিল। তিনি বলেন, আমি নিকটে বসবাসের কারণে সেই ছোট্ট কক্ষে হুযূরের আসার অপেক্ষায় ছিলাম, এমতাবস্থায় হুযূর বায়তুদ্ দোয়া থেকে বাইরে আসেন এবং চৌকির ওপরে আসন গ্রহণ করেন। আমাকে বলেন, মৌলভী সৈয়্যদ সরওয়ার শাহ্ সাহেবকে বলুন, আমাদের জন্য যেন এখানে কিছু খাবার নিয়ে আসেন। সে যুগে অতিথি এসেছিলেন, তাই খাবার একসাথে রান্না করা হতো, আর এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ছিল সরওয়ার শাহ্ সাহেবের ওপর। তিনি বলেন, আমি গিয়ে নির্দেশ পৌঁছে দিই, ঠিক সেই সময়েই আমরা খাবার খাওয়া শেষ করেছিলাম। বড়োজোর দশ মিনিট পার হয়ে থাকবে, কিন্তু কোনো খাবার অবশিষ্ট ছিল না। দশ মিনিটের মধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছিল, এরপরও খাবার ছিল না, লোকেরা খেয়ে নিয়েছিল। তিনি বলেন, আমার পয়গাম শুনে মৌলভী সরওয়ার শাহ্ সাহেবের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। যাহোক, তিনি একটি ছোট্ট পেয়ালায় দুধ নেন এবং একটি পিরিচে তিনটি টোস্ট আর চিনি নিয়ে আসেন। তার মুখ মলিন ছিল, তিনি (এই ভেবে) অত্যন্ত বিষণ্ন ছিলেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) খাবার চেয়েছেন অথচ খাবার নেই। তিনি নিবেদন করেন, হুযূর! এই মুহূর্তে অন্য আর কোনো খাবার নেই। যুলফিকার আলী খান সাহেব বলেন, আমি অত্যন্ত বিস্মিত হই যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জন্য খাবার রাখা হয়নি, এটি কেমন ব্যবস্থাপনা!

(কিন্তু) হুযূর (আ.) পরম কৃতজ্ঞতার সাথে, যা তাঁর চেহারায় সুস্পষ্ট ছিল- [তা কেবল লোকদেখানো বা কৃত্রিম ছিল না, বরং তা ছিল কৃতজ্ঞতার প্রকাশ যা তাঁর চেহারায়ও ফুটে উঠেছিল] তিনি বলেন, সেই টোস্ট দুটিতে চিনি লাগিয়ে খেয়ে নেন এবং তার পর পানি পান করেন।

তিনি (রা.) বলেন, তখন আমার মনে এই চিন্তার উদয় ঘটে যে, আল্লাহ্ তা'লা এই ভুলটি এজন্যই করিয়েছেন যেন হুযূরের ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা এবং মর্যাদা বিশ্ববাসীর সামনে প্রকাশ পায়। [আসহাবে আহমদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ:৫৪]

সাহাবীরা (রা.) ছোটোখাটো বিষয়ও লক্ষ্য করতেন।

৭ই আগস্ট, ১৯০০ সালে হুযূর (আ.) হযরত নবাব মুহাম্মদ আলী খান সাহেবকে একটি ধন্যবাদ জ্ঞাপক পত্র লিখতে গিয়ে বলেন। তিনি কিছু কাপড় উপহার পাঠিয়েছিলেন, (হুযূর লিখেন), "আপনার চমৎকার ও উন্নত কাপড়ের উপহার, যা আপনি ঐকান্তিক ভালোবাসা ও নিষ্ঠার সাথে প্রদান করেছেন, তা আমি পেয়েছি, আমি এর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। প্রতিটি কাপড় দেখে মনে হয়, আমার প্রিয় বন্ধু অত্যন্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সাথে সেগুলো তৈরি করিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা এর বিনিময়ে স্বীয় অসীম ও অফুরন্ত আশিস ও কৃপা আপনার প্রতি বর্ষণ করুন এবং তাকওয়ার পোশাকে আউলিয়া ও পুণ্যবানদের রঙে পূর্ণরূপে রঙিন করে সম্মানিত করুন।" [আসহাবে আহমদ, ২য় খণ্ড-৬৮৬-৬৮৭]

তাঁকে (হুযূরকে) বাহ্যিক পোশাক দিয়েছিলেন, তখন তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পাশাপাশি এর উত্তরে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে পূর্ণরূপে তাকওয়ার পোশাকে সজ্জিত করুন এবং পুণ্যবানদের আদর্শে সম্মানিত করুন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হযরত মুনশী আহমদ জান সাহেবকে লেখা তাঁর এক পত্রে লেখেন, "আমার শ্রদ্ধেয়, সম্মানিত ভাই মুনশী আহমদ জান সাহেব, সাল্লামাহুল্লাহু তা'লা ওয়া জাযাকুমুল্লাহু খাইরাল জাযা। আসসালামু আলাইকুম। আপনার প্রীতিপত্র পৌঁছেছে। খোদা তা'লার অনুগ্রহরাজির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শেষ করা যায় না, যিনি এই অধম দাসের জন্য এমন আন্তরিক

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনি, যিনি পরম রিয্‌কদাতা, শক্তির অধিকারী, সুদৃঢ়। (আয যারিয়াত: ৫৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdur Rahaman Sb. Berhampur, Murshidabad

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

হে খোদার বান্দাগণ! নিজেদের হৃদয়কে নির্মল কর ও অন্তরকে ধুয়ে ফেল। তোমরা কপটতা ও দ্বৈততা (দু'মুখী স্বভাব)- এর দ্বারা সবাইকে রাজী করতে পার কিন্তু এ স্বভাবের দ্বারা তোমরা খোদার ক্রোধকে উত্তেজিত করবে।

(রাযে হাকীকাত, পৃ: ১০)

দোয়াপ্রার্থী: Late-Azima Khatun
From: Mirza Enayetulla Sb, Harhari, Murshidabad

বন্ধুদের দিয়েছেন, যাদের অস্তিত্ব এই নগণ্য ব্যক্তির জন্য সম্মান ও গর্বের কারণ। খোদা তা'লা আপনাকে সুখী ও আনন্দিত রাখুন এবং আপনাকে এই আন্তরিক মনোভাবের পুরস্কার দান করুন। (পরম বিনয়ের সাথে তিনি বলছেন,) এই অধম চরম অকর্মণ্য ও তুচ্ছ, আর এটি পরম দয়ালু খোদার একান্ত কৃপা ও অনুগ্রহ যে, তিনি এই অযোগ্য ব্যক্তির ওপর এক বিন্দু অধিকার ছাড়াই অগণিত অনুগ্রহ বারি বর্ষণ করছেন। আমি নিজের (মাঝে) কেবল ত্রুটি আর ত্রুটিই দেখতে পাই। [হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যে মর্যাদা ছিল তা লক্ষ্য করুন এবং এরপর তাঁর বিনয় দেখুন!)। তিনি (আ.) বলেন, আমি কেবল নিজের ত্রুটি আর ত্রুটিই দেখতে পাই, আর আল্লাহ্ তা'লা কেবল অনুগ্রহের পর অনুগ্রহই করে চলেছেন। আর আল্লাহ্ তা'লা কেবল আমার অন্যায় আর অন্যায়ই দেখতে পান কিন্তু উপর্যুপরি পুরস্কার দিয়ে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি অত্যন্ত দয়ালু ও কৃপালু। এমন ভাষা কোথায় পাব যা দিয়ে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো? এই অধম অতি তুচ্ছ, হীন, রিক্ত এবং একেবারে কপর্দকশূন্য। তিনি আমাকে ধুলোর মাঝে পেয়েছেন এবং তুলে নিয়েছেন, এবং আমাকে সম্পূর্ণ অযোগ্য পেয়েছেন আর আমার দোষত্রুটি ঢেকে রেখেছেন। আমার দুর্বলতার প্রতি দৃষ্টিপাত করে তিনি স্বয়ং আমাকে শক্তি প্রদান করেছেন এবং আমার নির্বুদ্ধিতা দেখে তিনি স্বয়ং আমাকে জ্ঞান দান করেছেন। আমার অবস্থার ওপর তিনি এত বেশি অনুগ্রহ করেছেন যা আমি গণনা করে শেষ করতে পারব না। আর তাঁর অনুগ্রহরাজিরই একটি বিকাশ হলো যে, আপনার মতো শ্রদ্ধেয় ভাইদের অন্তরে এই অধমের ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। "

[সাহায্যকারীদের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ধরনটি কেমন দেখুন!] অতএব, তাঁর অনুগ্রহরাজির কাছে প্রত্যাশা হলো, তিনি এই হৃদ্যতাকে অর্থাৎ ভালোবাসাকে বৃদ্ধি করবেন এবং তিনি সেসব মানুষের প্রতি কৃপা করবেন যাদেরকে এই মালায় গ্রথিত করেছেন।" এই পত্রটি লেখার পর তিনি লিখেছেন যে, কোনো এক বুযুর্গের এই পঙক্তিটি (তাঁর প্রতি) এলহাম হিসেবে অবতীর্ণ হয়,

"ہرگز نمیرد آنکہ دلش زندہ شد بعشق / ثبت است بر جریدۂ عالم دوام ما"

যার হৃদয় ভালোবাসার স্পর্শে জাগ্রত হয়েছে, সে কখনো মরে না। পৃথিবীর ইতিহাস-গ্রন্থে আমাদের চিরন্তন জীবনের কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়ে গেছে।

[মাকতুবাতে আহমদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৫-২৬]

এক চিঠিতে তিনি হযরত কাযী যহুর উদ্দীন আকমল সাহেবের উদ্দেশ্যে লিখেছেন: আপনার বইগুলো অর্থাৎ তিনি এর সমর্থনে কিছু বই প্রেরণ করেছিলেন। আপনার তিনটি বই-ই উপহারস্বরূপ আমার কাছে পৌঁছেছে। জাযাকুমুল্লাহু খাইরান, আমি তিনটিই একটু একটু করে দেখেছি। লেখাগুলো চমৎকার ও যুক্তিপূর্ণ। আল্লাহ তা'লা আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। আমীন। সুযোগ অনুযায়ী উপযুক্ত সময়ে এগুলো আপনার প্রকাশ করা উচিত, যেন দ্বিগুণ সওয়াব পাওয়া যায়।" [মাকতুবাতে আহমদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৪৫]

একইভাবে ডাক্তার খলীফা রশীদ উদ্দীন সাহেবকে লেখা এক চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, ডাক্তার খলীফা রশীদ উদ্দীন সাহেব (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) ছিলেন হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর শ্বশুর এবং হযরত উম্মে নাসির (রা.)-এর পিতা। তিনি লিখেছেন: আমার প্রিয় ভাই ডাক্তার খলীফা রশীদ উদ্দীন সাহেব! আসসালামু আলাইকুম। আপনার পাঠানো ৫০ রুপি আমার কাছে পৌঁছেছে। এমন এক সংকটাপন্ন ও চরম প্রয়োজনের মুহূর্তে এটি এলো, যখন হিংসুকরা আদালতে আমার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। আপনার এ ধারাবাহিক আর্থিক সহযোগিতা অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও কৃতজ্ঞতা পাবার যোগ্য। জাযাকুমুল্লাহু খাইরুল জাযা। এবার মামলার তারিখ সম্পর্কে আপনি জানিয়েছেন যে, তা ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯। আর আপনি বলেছেন, এই দিনটি রবিবার এবং সম্ভবত রবিবার ঈদ হবে। আবার পরদিন সোমবার পাঠানকোট আদালতে মামলা উপলক্ষ্যে যেতে হবে। ওয়াল্লাহু আ'লামু। তিনি বলেন, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, কিছু সময় আপনার জন্য দোয়া করব। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তিনি বলেছেন, আমি কিছুদিন আপনার জন্য দোয়া করতে থাকব। আল্লাহ তা'লা আপনাকে বিচ্ছেদ ও বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত রেখে নিরাপত্তা ও কল্যাণ দান করুন। কারণ তিনি দূরবর্তী অঞ্চলে কর্মরত ছিলেন এবং সেখান থেকে আসতে চাইতেন। তিনি আরো বলেন: আমীন, আল্লাহ তা'লা আপনাকে নিরাপত্তা ও কল্যাণ দান করুন। আমীন সুম্মা আমীন।

[মাকতুবাতে আহমদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ২১৪]:

একইভাবে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) হযরত সাহেবযাদা সিরাজুল হক সাহেবকে লেখা এক চিঠিতে উল্লেখ করেন: আমার শ্রদ্ধেয় ভাই সাহেবযাদা সিরাজুল হক সাহেব! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনার পাঠানো উপহার পাগড়ি এবং আতর আমার কাছে পৌঁছেছে। [দেখুন! সামান্য জিনিস- সেজন্যও চিঠি লিখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন।] আপনার এ বন্ধুত্বপূর্ণ উপহারের জন্য আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। جَزَاكُمُ اللهُ خَيْرَ الْجَزَاءِ وَاَحْسَنَ اِلَيْكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْعُقْبٰى। আল্লাহ তা'লা আপনাকে অনেক সুখে রাখুন এবং জাগতিক ও ধর্মীয় সমস্ত অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন।

[মাকতুবাতে আহমদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১১০]

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পাশাপাশি তিনি তার এবং সকলের ধর্মীয় অগ্রগতির জন্যও দোয়া করতেন।

সৈয়দ মাহমুদ আলম সাহেব বর্ণনা করেন, হযরত মৌলবি নূরুদ্দীন সাহেব বলতেন- হযরত মসীহ মাউদ (আ.) যখন আরবী ভাষায় ঈদুল আযহিয়ার খুতবা পাঠ করছিলেন, তখন পরবর্তীতে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: ফেরেশতারা আমার সামনে বড়ো বড়ো হরফে লেখা ফলক নিয়ে আসছিলেন, যা দেখে দেখে পাঠ করা হচ্ছিল। একটি ফলক আসত এবং আমি যখন তা শুনিয়ে ফেলতাম তখন দ্বিতীয়টি আসত আর প্রথমটি সরে যেত। এভাবে একের পর এক ফলক আসার ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। যখন কোনো লেখার ব্যাপারে পুনরায় জানতে চাওয়া হতো, কারণ তিনি দুইজন লোক লেখার জন্য প্রস্তুত করে বসিয়েছিলেন, তখন তিনি বলেন, সেই চলে যাওয়া ফলকটি আবার ফিরে আসত, যা দেখে আমি পুনরায় বলে দিতাম।

খুতবা শেষ হলে তিনি সিজদায়ে শুকরে (তথা কৃতজ্ঞতার সিজদায়) লুটিয়ে পড়েন। উপস্থিত সবাই তাঁর সাথে সিজদায়ে শুকর আদায় করেন। সিজদা থেকে মাথা তুলে হযরত আকদাস (আ.) বলেন: এখন আমি লাল অক্ষরে 'মুবারক' লেখা দেখলাম। এটি সম্ভবত কবুলিয়তের একটি নিদর্শন।"

[তাজকেরা, পৃ: ৩৩৪-৩৩৫]

হযরত মিয়াঁ ফিরোয দ্বীন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আকদাস (আ.) মীর হুসামুদ্দীন সাহেবের ঘরের ছাদে বসে 'লেকচার সিয়ালকোট' লিখেছিলেন। চারদেয়ালের ওপর চারটি দোয়াত রাখা ছিল- ছোটো দেয়াল ছিল, তার ওপরে দোয়াতগুলো রাখা ছিল। তিনি লিখতে লিখতে পায়চারি করতেন এবং পায়চারি করতে করতেই লিখে ফেলতেন।

তিনি বলেন, আনুমানিক আসরের সময় ছিল; হুযূর পায়চারি করতে করতে লিখছিলেন এবং মাঝে মাঝে সিজদায় লুটিয়ে পড়ছেন। অর্থাৎ, সে মুহূর্তে হয়ত আল্লাহ তা'লা কোনো বিশেষ বিষয় বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, যার জন্য তিনি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সিজদা আদায় করতেন।

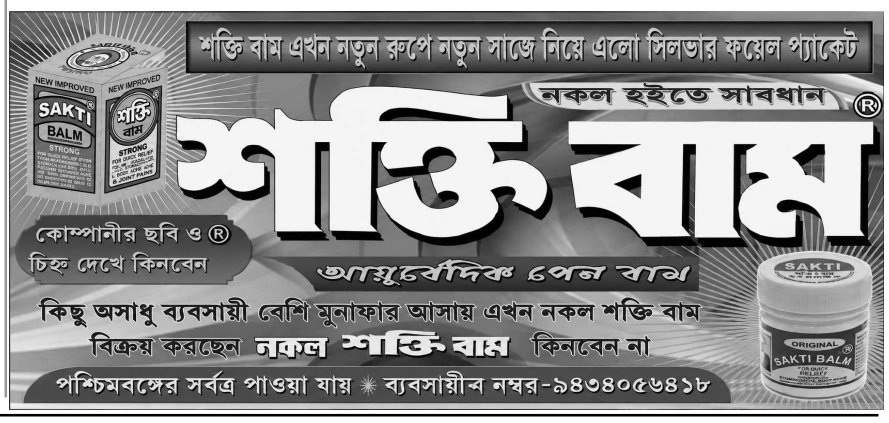
লিখতে লিখতে হঠাৎ থেমে গিয়ে তিনি সিজদায় চলে যেতেন। তিনি বলেন, এ পুরো দৃশ্য আমরা আমাদের ঘরের ছাদে দাঁড়িয়ে দেখেছি এবং আরো অনেক মানুষ আমাদের ঘরে এ দৃশ্যটি দেখার জন্য জমা হয়েছিল। আমাদের বাড়িটি ঐ বাড়িটির কাছাকাছি এবং উঁচু ছিল; ফলে পুরো দৃশ্যটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল যে, কীভাবে তিনি বই লিখছেন এবং একইসাথে কীভাবে আল্লাহ তা'লার কৃতজ্ঞতাও আদায় করছেন।

[আসহাবে আহমদ,৪র্থ খণ্ড, পৃ:৩৭৫]

তাঁর (আ.) কৃতজ্ঞতা প্রকাশের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে একজন সাহাবী হযরত খয়ের উদ্দীন সাহেব (রা.) বলেন, একবার আমাদের গ্রাম কাদেরাবাদে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আসেন। তখন আমার মা তাজ বিবি সাহেবা এক থালা চিনি উপহার দেন। হুযূর সেই চিনি দাদির আঁচলে ঢেলে দেন- তখন তার দাদি সেখানে বসা ছিলেন, তাকে তা দিয়ে দেন এবং জাযাকুমুল্লাহ বলেন আর আমাদের জন্য দোয়া করেন। [আসহাবে আহমদ,৩য় খণ্ড, পৃ:৮৯]

এভাবে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর জিনিসের জন্যও তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন।

হাজী মুহাম্মদ দ্বীন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একবার হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সম্পর্কে আমি জানতে পারলাম, কোনো এক উপলক্ষ্যে তিনি সিয়ালকোট আসছেন। নির্ধারিত তারিখে আমিও সাক্ষাৎ লাভের আগ্রহে সেখানে পৌঁছে যাই। হুযূর একটি বাড়ির দোতলায় অবস্থান করছিলেন এবং অনুরাগী ভক্তকুলের এক জনসমাবেশ নীচে দর্শন লাভের আশায় অপেক্ষা করছিল। এমন সময় তিনি নীচে নেমে এলেন এবং উপস্থিত সকলকে সাক্ষাতের সৌভাগ্য দান করলেন। একজন বৃদ্ধ লোক যখন হুযূরের সাথে সাক্ষাৎ করলেন, তখন তিনি হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলেন। হুযূর তাকে সান্ত্বনা দিয়ে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি নিবেদন করলেন, হুযূর! আমি হযরত ইমাম মাহদীর আগমন পর্যন্ত বেঁচে থাকার জন্য দোয়া করতাম। হুযূর বললেন, চাচা! তাহলে তো আল্লাহ তা'লা আপনার দোয়া কবুল করেছেন। এতে তিনি খুব খুশি হলেন এবং নিজের এক নাতিকে হুযূর (আ.)-এর সামনে এনে নিবেদন করলেন, তার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিন এবং তার জন্য দোয়া করুন। হুযূর দোয়া করলেন এবং ওপরে চলে গেলেন। যাবার সময়- সামনে এটি হযরত মসীহ



মওউদ (আ.)-এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে, আগেরটি ছিল প্রেক্ষাপট- আসল ঘটনাটি হলো: তিনি বলেন, যাওয়ার সময় দুর্ঘটনাবশত হুযূর যখন ওপরে যাচ্ছিলেন, তখন তার একটি জুতা পা থেকে খুলে আসছিল, যা খুবই সাদামাটা জুতা ছিল। আমি সেটি তুলে নিজ হাতে তাঁর পায়ে পরিয়ে দিলাম। এতে হুযূর হাসিমুখে ও ভালোবাসাপূর্ণ বাক্যে বললেন- জাযাকাল্লাহ এবং অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।" [আসহাবে আহমদ,৫ম খণ্ড, পৃ:৩৩৪]

তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার কোনো সুযোগই হাতছাড়া হতে দিতেন না।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) হযরত মুন্সি রুস্তম আলী সাহেবকে লেখা একটি চিঠিতে লেখেন, মুন্সি রুস্তম আলী সাহেব (তাঁর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক)! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মিয়াঁ ইমাম উদ্দীন সাহেবের মাধ্যমে প্রেরিত আপনার ৫০ রুপি এসে পৌঁছেছে। আপনি এবং চৌধুরী মুহাম্মদ বখশ সাহেব যে পরিমাণ চেষ্টা করেছেন মহাপ্রতাপান্বিত খোদা তার সর্বোত্তম প্রতিদান দিন। আর ইহকাল ও পরকালে সফল করুন। এই পত্র লেখার সময় পর্যন্ত এখানে সবকিছু ঠিকঠাক আছে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) নিজের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন।

[মাকতুবাতে আহমদ, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৬৭-৪৬৮]

সকল কথায় সবার প্রতি কোনো ছোটো বিষয় হলেও তিনি (আ.) কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন।

একটি ঘটনা আছে। হযরত মিয়া মীরা বখশ সাহেব বর্ণনা করেন, এ অধম প্রায় ১৮৯৭ বা ১৮৯৮ সালে হযরত আকদাস মসীহে মওউদ ও মাহদিয়ে মাসউদ (আ.)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করি, কিন্তু আমার পিতার কাছে কিছুদিন পর্যন্ত এ বিষয়টি প্রকাশ করিনি। শেষ পর্যন্ত আর কতদিনই বা গোপন রাখা সম্ভব! বিষয়টি প্রকাশ হয়ে গেল। তখন আমার পিতা আমাকে স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করে (একথা বলে) বাড়ি থেকে বের করে দিলেন- "তুমি আহমদী হয়ে গেছ, এখন আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও।" এ অধম রিজিকদাতা খোদার ওপর ভরসা করে ভিন্ন একটি দোকান ভাড়া নিয়ে নিলাম। অভাব-অনটন ছিল, কিন্তু অন্তরে প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল- যেভাবেই হোক, নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জন্য একটি পোশাক তৈরি করে নিজের হাতে সেলাই করে, [তিনি একজন দর্জি ছিলেন,] সেটি হুযূরের খেদমতে পেশ করব। এই চিন্তা থেকে তিনি বলেন, আমি একটি মসলিনের কুর্তা, একটি লাঠের শালওয়ার, একটি কালো রঙের কোট এবং একটি মসলিনের পাগড়ি কিনে নিজের হাতে সেলাই করে (বিশেষ) পোশাক তৈরি করলাম। এরপর এদিক-ওদিক থেকে ভাড়া জোগাড় করে কাদিয়ান শরিফে পৌঁছালাম। পরের দিন ছিল শুক্রবার। তাই আমার মনে হলো, যদি সম্ভব হয়, তাহলে এ অধম আজই এই নগন্য উপহারটি হুযূরের খেদমতে পৌঁছে দিব; হয়তো হুযূর জুমার নামাযের আগেই এটি পরে এই গরিবের মনোস্তুষ্টি করবেন। এইসব চিন্তা করতে করতে শেষ পর্যন্ত কাজী জিয়াউদ্দিন সাহেবের দোকানে পৌঁছে গেলাম এবং তাঁর কাছে আমার মনের ইচ্ছার কথা খুলে বললাম। তিনি তা শুনেই বললেন, "চল মিয়াঁ, আমি তোমাকে হুযূরের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি।" তিনি সঙ্গে সঙ্গেই উঠে আমাকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কাছে নিয়ে গেলেন। তখন হুযূর (আ.) একটি তক্তপোশের ওপর বসে কিছু লিখছিলেন এবং খাজা কামালউদ্দিন সাহেব তক্তপোশের সামনে একটি চাটাইয়ের ওপর বসে ছিলেন। আমরাও দুজন সেখানে খাজা সাহেবের কাছে বসে পড়লাম। খাজা সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, "এ সময় আপনি কী উদ্দেশ্যে এসেছেন?" তখন কাজী সাহেব আমার ইচ্ছার কথা তাঁকে জানিয়ে দিলেন। খাজা সাহেব কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন, তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন- "কী মিয়াঁ, আমি কি তোমার উকিল হয়ে যাব?" খাজা সাহেব উকিল ছিলেন, তাই এই সময়ও তিনি নিজের পেশার ভাষাই ব্যবহার করলেন। তিনি বলেন, তখন আমি বললাম, "এটা তো আপনার পক্ষ থেকে অনেক বড় অনুগ্রহ হবে। আপনি আমার উকিল হয়ে যান।" এরপর খাজা সাহেব আমার কাছ থেকে কাপড়গুলো নিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সামনে পেশ করলেন এবং সঙ্গে এ কথাও বললেন- "হুযূর, এই ছেলেটির ইচ্ছা, হুযূর যেন এই কাপড় পরে জুমার নামায পড়েন।" খাজা সাহেবের এ কথা শুনে হুযূর, যিনি অনুগ্রহ ও দানের ভাণ্ডার, কাপড়গুলো তুলে নিয়ে পরতে শুরু করলেন। কিন্তু যখন কোর্টটি পরলেন তখণ দেখা গেল- সেটি খুব আঁটসাঁট। আমি বললাম, "হুযূর, কোর্টটি খুব আঁটসাঁট। আপনি যদি এটি খুলে দেন, তাহলে আমি এটি কিছুটা ঢিলা করে দিতে/আনতে পারি।" [সম্ভবত সেখানে পরেন নি, ঘর থেকে পরে এসে থাকবেন। নিজের কাজ ছেড়ে যান এবং কাপড় পরে ফিরে আসেন।] তিনি বলেন, কোর্টটি যখন পরলেন, তখন সেটি টাইট ছিল। তাই হুযূর কোর্টটি খুলে আমাকে দিয়ে দিলেন। আমি বললাম, "আমি ঠিক করে দিচ্ছি, এটি একটু টাইট হয়েছে।" তিনি বলেন, তখন আমি তাড়াতাড়ি উঠে সেটি বাজারে নিয়ে এলাম এবং দর্জির দোকানে বসে কোটের পিঠের পুরো চাপটা খুলে দিলাম, তারপর আবার হুযূরের খেদমতে হাজির হলাম। এরপর হুযূর সেটি পরলেন। কিন্তু তখনও কোটের বোতামগুলো হুযূরের মনমতো ঠিকভাবে মিলছিল না, বন্ধ হচ্ছিল না। কিন্তু তবুও হুযূর আমার মনোস্তুষ্টির জন্য টানাটানি করে বোতাম লাগিয়ে নিলেন এবং একটুও ভ্রুক্ষেপ করলেন না যে, এই কাপড়গুলো পরার উপযুক্ত কি না। [আসহাবে আহমদ, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৬৮-৩৬৯]

তিনি এই অবস্থাতেও কাপড়গুলো পরে সেই ছেলেটির- যে নতুন নতুন আহমদী হয়েছিল এবং উপহার নিয়ে এসেছিল- তার আবেগের প্রতিও খেয়াল রাখলেন। আর এরপর তিনি এর জন্যও অনেক বেশি কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করলেন।

হযরত মিয়াঁ সাইফুল্লাহ সাহেব বর্ণনা করেন, আমি একবার কাদিয়ান যাই। এক ব্যক্তি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সামনে পঞ্চাশ-ষাট রুপির একটি স্তূপ রেখে দিল, কিন্তু হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সেদিকে ফিরেও তাকালেন না। সাধারণত লোকেরা কিছু দিলে তিনি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন, কিন্তু সম্ভবত এর মধ্যে কোনো বিশেষ কারণ ছিল।

তবে যাই হোক, তিনি বলেন, লোকটি নগদ টাকা দিয়েছিল, হুযূর সেদিকে কোনো মনোযোগই দিলেন না। এমন সময় একজন বৃদ্ধা, যিনি সম্ভবত হিন্দিনি ছিলেন, তার সঙ্গে একটি শিশুও ছিল। তার কাপড়ের মধ্যে গুড়ের একটি পাটালি বাঁধা ছিল। সেই নারী নিবেদন করল, "হুযূর, এই শিশুটি আপনার জন্য গুড়ের পাটালি এনেছে। হুযূর, এর জন্য দোয়া করুন।" হুযূর বললেন, "খুব ভালো," এবং তিনি খুব খুশি হলেন। এরপর সেই শিশুর হাত থেকে গুড়ের সেই পাটালিটি কাপড়সহ নিলেন এবং কাঁধে রাখলেন। "

[আসহাবে আহমদ, ৪থ খণ্ড, পৃ: ৪৫৩]

তখন সেই দরিদ্র শিশুটির কাছ থেকে সেই সামান্য উপহারটি নিয়ে তিনি তার অনেক মুল্যায়ন করলেন, তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন এবং তার জন্য দোয়াও করলেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আহমদী জাতির উদ্দেশে একটি চিঠিতে বলেন, "সর্বাগ্রে আমার অন্তর থেকে আল্লাহ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, যিনি আমার জামাতকে আন্তরিক সংকল্প, ভালোবাসা ও সহানুভূতি দান করেছেন।" যদি খোদা তা'লার অনুগ্রহ তাদের সহায় না হতো, তাহলে তাদের কখনোই এই সৌভাগ্য দেওয়া হতো না যে, তারা সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুমের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এমন পর্যায়ের আনুগত্য করবে যে, নিজেদের আর্থিক সংকট ও স্বল্প আয় সত্ত্বেও নিজেদের সামর্থ্যের চেয়ে বেশি আর্থিক সেবায় নিয়োজিত হবে। আমি দোয়া করি, খোদা তা'লা তাদের সবার ধন-সম্পদে বরকত দিন এবং ধর্মের উদ্দেশ্যসমূহ পূর্ণ করার জন্য তারা যে সাহায্য ও সহযোগিতা করছে, খোদা তা'লা তা (ইহকাল ও পরকাল) উভয় জগতেই তাদের কল্যাণের কারণ করুন।" [মকতুবাতে আহমদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩৬৫]

এরপর উপদেশ দিতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "আল্লাহ তা'লা যাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, সেই অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপায় হলো, তাঁর সৃষ্টির উপকার করা ও তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং খোদাপ্রদত্ত এই অনুগ্রহের কারণে অহংকার না করা, আর বন্য পশুর মতো গরিবদের পিষে না ফেলা" [মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৩১৪]

অর্থাৎ গরিবদের সাহায্যের প্রতিও তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আল্লাহ তা'লার কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করে তিনি কখনো কখনো মানুষের বিভিন্ন বিষয়-ব্যাপার সম্পর্কেও আগে থেকেই খবর দিতেন, অথবা বিরোধীদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'লার কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করে বলতেন যে, তার সঙ্গে এই এই ঘটনা ঘটবে। কিন্তু কখনো কখনো আল্লাহ তা'লার হিকমতের কারণে সেগুলো পূর্ণ হতে সময় লেগে যেত। এমন সময়ে তিনি অস্থির হয়ে পড়তেন এবং দোয়ায় লেগে যেতেন যে, বিরোধীরা এ নিয়ে হৈচৈ করবে। কিন্তু যখন কথাটি পূর্ণ হয়ে যেত, তখন তিনি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আল্লাহ তা'লার দরবারে সিজদায় লুটিয়ে পড়তেন।

এক জায়গায় হযরত মসীহে মওউদ (আ.) বলেন, "একবার আমি শরমপৎ খত্রীর ভাই বিশম্বর দাসের বিষয়ে একটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম যে, তার বিরুদ্ধে যে ফৌজদারি মামলা হয়েছিল, তা থেকে সে খালাস পাবে না, তবে অর্ধেক কারাদণ্ড ভোগ করার পর মুক্তি পাবে। এরপর এমন ঘটনা ঘটল যে, যখন বিশম্বর দাস অর্ধেক কারাদণ্ড ভোগ করে মুক্ত হয়ে গেল, ভবিষ্যদ্বাণীতে আগে থেকেই যেভাবে বলা হয়েছিল সেভাবে, তখন তার উত্তরাধিকারীরা প্রত্যাশার সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে এই খবর ছড়িয়ে দিল যে, বিশম্বর দাস খালাস পেয়েছে। তখন রাতের সময় ছিল এবং আমি আমার বড় মসজিদে নামায পড়ার জন্য গিয়েছিলাম। যখন আলী মুহাম্মদ নামের কাদিয়ান নিবাসী এক মোল্লা, মসজিদে এসে বলল যে, বিশম্বর দাস খালাস পেয়েছে এবং বাজারে লোকেরা তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে, তখন এই খবর শুনেই আমি খুব কষ্ট পেলাম এবং মনে অস্থিরতা সৃষ্টি হলো যে, গোঁড়া হিন্দুরা এই বিষয়টি নিয়ে আক্রমণ করবে- 'তুমি তো খবর দিয়েছিলে যে, বিশম্বর দাস খালাস পাবে না; দেখো, সে খালাস পেয়ে গেছে।' এই দুঃখে নামাযের একেকটি রাকাত আমার কাছে একেকটি বছরের সমান হয়ে গেল এবং যখন আমি নামাযে এক রাকাতে সিজদায় গেলাম তখন আমার বেদনা চূড়ান্ত সীমা পর্যন্ত পৌঁছে গেল, তখন

সিজদার অবস্থাতেই উচ্চস্বরে খোদা আমাকে সম্বোধন করে বললেন, 'লা তাখাফ ইন্নাকা আনতাল আলা' অর্থাৎ, তুমি বিন্দুমাত্র ভয় পেও না, তুমিই বিজয়ী হবে। এরপর আমি অপেক্ষমান রইলাম যে, ভবিষ্যদ্‌বাণীটি কীভাবে পূর্ণ হবে। কিন্তু কোন নিদর্শন প্রকাশিত হয় নি। আমি বারংবার শরমপতকেই জিজ্ঞেস করতাম, এটি কি সত্য যে বিসম্বরদাস খালাস পেয়ে গেছে? তখন সে উত্তর দিত, প্রকৃতপক্ষেই সে খালাস পেয়ে গেছে। আমার মিথ্যা বলার কী প্রয়োজন পড়েছে। সেই হিন্দু এ কথাই বলতো। এই গ্রামে যাকেই জিজ্ঞেস করতাম সে এটাই বলতো যে, আমরাও শুনেছি সে খালাস হয়ে গিয়েছে। এভাবে কমবেশি ছয়মাস অতিক্রান্ত হলো। দৃষ্কৃতকারী লোকেরা তাদের চিরন্তন অভ্যাস অনুযায়ী হাসি বিদ্রুপ করতো। কিন্তু শরমপত ঠাট্টা বিদ্রুপ করতো না। যার কারণে আমার বিশ্বাস ছিল যে, এখন সে আমার সাথে ভদ্রোচিত আচরণ করছে। কিন্তু তবুও আমি তার সম্মুখে লজ্জিত হতাম। আমি এতটা গুরুত্বের সাথে তাকে তার ভাইয়ের খালাস না হওয়ার সংবাদ দিয়েছিলাম। কিন্তু এখন এই অবস্থা দেখা দিয়েছে।

কিন্তু তবুও আমি আমার খোদার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখতাম এবং আমার বিশ্বাস ছিল যে, খোদা কোন অলৌকিক নিদর্শন দেখাবেন এবং খুব সম্ভব যে, খালাস হবার পর পুনরায় আটক হবে। কিন্তু আমি জানতাম না যে, খালাস প্রাপ্তির এই সংবাদটাই বানোয়াট। মিথ্যা সংবাদ ছিল যা ছড়ানো হয়েছিল।

এরপর ঘটনাচক্রে সকালে প্রায় আট ঘটিকায় বাটালার একজন তহসীলদার হাফেয হিদায়াত আলী তার নাম ছিল, সরকারি সফরে কাদিয়ানে আসে। কেননা কাদিয়ান বাটালা তহসীলের অধীনস্থ ছিল। সে আমাদের বাড়িতে আসে আর এখনো ঘোড়া থেকেও নামে নি, এমন অবস্থায় কয়েকজন হিন্দু তাদের প্রথা অনুযায়ী তাকে সালাম করার জন্য আসলো। তাদের মাঝে বিশম্বর দাসও ছিল। তখন তহসীলদার বিশম্বরদাসকে দেখে বললো, বিশম্বরদাস! আমি এতে আনন্দিত যে, তুমি বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেয়েছ, কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, তুমি খালাস পাও নি। আমি এ কথা শুনতেই কৃতজ্ঞতার সিজদা করলাম এবং তৎক্ষণাত শরমপতকে ডেকে বললাম, তুমি কেন এতদিন পর্যন্ত বিশম্বরদাস খালাস পেয়ে গেছে বলে আমার কাছে মিথ্যা কথা বলেছ, আর আমাকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দিয়েছ? সে উত্তরে বললো, একটি অপারগতায় এই মিথ্যা বলতে হয়েছে আর এর কারণ হলো, আমাদের গোত্রে বিবাহের সম্বন্ধের সময় ছোট ছোট বিষয়ে ছিদ্রান্বেষণ করা হয়। আর কারো দুশ্চরিত্র হওয়া প্রমাণিত হলে কনে পাওয়া কঠিন হয়ে যায়। এই অপারগতায় আমি ঘটনার বিপরীত বলেছি ও প্রচার করেছি এবং মিথ্যা বলেছি।"

[হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃ: ৩১৪-৩১৫]

(টীকা: হযরত আকদাস মসীহে মওউদ (আ.) তাঁর 'বারাহিনে আহমদিয়া', 'তিরিয়াকুল কুলুব', 'নুযুলুল মসীহ' প্রভৃতি গ্রন্থে এই নামটি 'বিশম্বরদাস' লিখেছেন। শুধু 'হাকীকাতুল ওহি' গ্রন্থে তিনি 'বিসম্বরদাস' অর্থাৎ 'স' (সিন) অক্ষর দিয়ে লিখেছেন।)

হযরত আকদাস (আ.) নিজের একটি নিদর্শনের উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, পণ্ডিত দয়ানন্দ ও তার অনুসারীদের ব্যাপারে একটি ভবিষ্যদ্‌বাণী পূর্ণ হয়েছে যেটি সম্পর্কে অবহিত হওয়া দর্শকদের জন্য বৃথা হবে না। যদিওবা সেটি লিখলে কিছুটা দীর্ঘায়িত হবে, কিন্তু যারা ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অনবহিত তাদের কল্যাণার্থে লেখা হচ্ছে। আর এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার পূর্বে একটি অদ্ভুত বিপদ ও সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। অর্থাৎ এখানেও তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী এজন্যই যেন ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশিত হয়, মহানবী (সা.)-এর পতাকা জগতে উড্ডীন হয়। তিনি (আ.) বলেন, পরিশেষে কৃপালু খোদা এ সমস্ত বিপদাবলী দূর করে ১০ সেপ্টেম্বর ১৮৮৩ইং সোমবার এই ভবিষ্যদ্বাণীটি পূর্ণ করেন।

এর বিস্তারিত বিবরণে লিখেন, ৬ সেপ্টেম্বর ১৮৮৩ বৃহস্পতিবার খোদা প্রয়োজনের মুহূর্তে এই অধমের সান্তনার জন্য নিজ বাণীর মাধ্যমে এই সুসংবাদ দেন, (ফারসি) অর্থাৎ একুশ টাকা আসতে যাচ্ছে। এই সুসংবাদে একটি অদ্ভুত বিষয় ছিল, যে অর্থ আসতে যাচ্ছে তার পরিমাণ বলা হয়েছে। আর কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা সম্পর্কে অবগত করা এটি আল্লাহ্ তা'লার বিশেষত্ব, অন্য কারো নয়। এটি সাধারণ কোন বিষয় নয় যে, সুনির্দিষ্ট অর্থের সংবাদ দেওয়া হচ্ছে যে, এত টাকা আসবে। দ্বিতীয় অদ্ভুত বিষয় ছিল যে, এটি পূর্বের কোন চাহিদা ব্যতিত ছিল। অর্থাৎ, এর আগে এমন কোনো চিন্তাই ছিল না। কেননা নির্ধারিত বইয়ের সাথে এই সংখ্যার কোনো সম্পর্ক ছিল না। সুতরাং এই সমস্ত আশ্চর্য ঘটনার কারণে ঘটনাটি ঘটার পূর্বেই এই ইলহাম কিছু আর্যদের জানানো হয়েছিল। ?এরপর ১০ সেপ্টেম্বর ১৮৮৩ইং তারিখে গুরুত্বে সাথে বারবার ইলহাম হলো, একুশ টাকা এসেছে, যা থেকে বোঝা গেল যে আজই এই ভবিষ্যদ্‌বাণী পূর্ণতা পাবে। সুতরাং ইলহাম হওয়ার হয়তো তিন মিনিটও অতিবাহিত হয়নি, ওয়াজির সিং নামের এক অসুস্থ লোক এলো এবং এসেই এক টাকা নজরানা পেশ করল। যদিও চিকিৎসা করা এই অধমের পেশা নয় আর যদি দৈবক্রমে কোনো অসুস্থ ব্যক্তি এসে যায় তবে কেবল সওয়াবের উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাস্তায় ওষুধ দেওয়া হয়, আমি কখনো টাকা নেই না। তিনি বলেন, তবে তার কাছ থেকে এই টাকাটি নেওয়া হয়, কারণ সাথে সাথেই মনে হলো যে, এটিও সেই ভবিষ্যদ্‌বাণীর একটি অংশ অর্থাৎ, একুশ টাকা আসার কথা ছিল।

এরপর পোস্ট অফিসে একজন নির্ভরযোগ্য মানুষকে এই উদ্দেশ্যে পাঠানো হলো যে হয়তো অবশিষ্ট অংশটি পোস্ট অফিসের মাধ্যমে পূর্ণ হবে। পোস্ট অফিস থেকে পোস্টমাস্টার যিনি একজন হিন্দু, উত্তরে বলেন, আমার কাছে ডেরা গাজী খান থেকে কেবল পাঁচ টাকার একটি মানি অর্ডার এসেছে, যার সাথে একটি কার্ডও সংযুক্ত আছে। তাই আমার কাছে এখনো টাকা আসে নেই, যখন আসবে তখন দিব। ?এই খবর শুনে ভীষণ উদ্‌বেগ সৃষ্টি হলো আর সেই অস্থিরতা তৈরি হলো যা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। কারণ এখানে অমুসলিমদের সামনে এই ভবিষ্যদ্‌বাণী বর্ণনা করা হচ্ছে যাতে ইসলামের সত্যতা প্রমাণিত হয়। তিনি বলেন, আমার ভেতরে চরম অস্থিরতা তৈরি হলো, যার ফলে এই অধম গভীরভাবে বেদনাপ্লুত হল এবং ভাবতে লাগল যে, পাঁচ আর এক মিলে তো ছয় হলো, এখন একুশ কীভাবে হবে? হে আল্লাহ, এটি কী হলো! ?সুতরাং এই ধ্যানের মাঝেই হঠাৎ পুনরায় এই ইলহাম হলো, (ফারসি) 'একুশ এসেছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই'। এই ইলহামের পর দিনের অর্ধেকও অতিবাহিত হয়নি, সে দিনই এক আর্য যে পোস্টমাস্টারের প্রথম বক্তব্যটি শুনেছিল, পোস্ট অফিসে গেল। পোস্টমাস্টার তাকে কোনো সমস্যার কারণ উল্লেখ করে জানায়, আসলে একুশ টাকাই এসেছে, ইতোপূর্বে এমনিতেই মুখ দিয়ে বের হয়ে গিয়েছিল যে, পাঁচ টাকা এসেছে।

সুতরাং সেই আর্য ব্যক্তি একটি কার্ডসহ বিশ টাকা নিয়ে এলো যা অ্যাকাউন্ট্যান্ট মুন্সি ইলাহি বখশ সাহেবের পক্ষ থেকে ছিল। পরে জানা গেল যে, সেই কার্ডটি মানি অর্ডারের কাগজের সাথে সংযুক্ত ছিল না। আরও জানা গেল, টাকা আগেই পৌঁছে গিয়েছিল এবং পোস্ট অফিসের রশিদের সূত্রে মুন্সি ইলাহি বখশ সাহেবের লেখা থেকে এটিও জানা গেল যে, মানি অর্ডার ৬ সেপ্টেম্বর ১৮৮৩ইং তারিখেই অর্থাৎ, যেদিন ইলহাম হয়েছিল, সেই দিনই কাদিয়ানে পৌঁছে গিয়েছিল।

অতএব, পোস্টমাস্টারের সম্পূর্ণ বক্তব্য ভুল প্রমাণিত হলো এবং অদৃশ্যের জ্ঞানসম্পন্ন মহান আল্লাহ্‌র সমস্ত কথা সত্য প্রমাণিত হলো। সুতরাং এই বরকতপূর্ণ দিনের স্মরণে এক টাকার মিষ্টি কিনে আর্যদের মাঝে বিতরণ করা হলো। তিনি এরপর এই খুশিতে আর্যদের মিষ্টি খাইয়েছিলেন, কেননা তাদের বলা হয়েছিল, দেখুন আল্লাহ তা'লা আমাকে এভাবে জানিয়েছেন। এই খুশিতে তাদের মিষ্টি খাওয়ানো হয়।

ফালহামদুলিল্লাহি আলা আলা-ইহি ওয়া নু'আমাইহি যাহিরিহা ওয়া বাতিনিহা (আল্লাহ তা'লার প্রকাশ্য ও গোপন সকল নিয়ামতের জন্য সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা কেবল তাঁরই প্রাপ্য)।

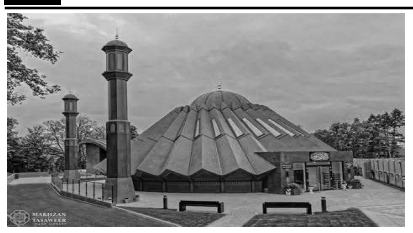
(বারাহিনে আহমদিয়া, চতুর্থ খণ্ড, রূহানী খাযায়েন, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬২৩-৬২৬, টীকা ৩-এর উপটীকা)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, "এমন কোনো জাতি নেই যেখানে আমার নিদর্শনসমূহ প্রকাশিত হয়নি এবং এমন কোনো সম্প্রদায় নেই যারা আমার নিদর্শনের সাক্ষী নয়। যদি এই নিদর্শনের সাক্ষীদের সংখ্যা দশ কোটিও বলা হয় তবে কোনো অতিরঞ্জন হবে না, কিন্তু বিরোধীদের অবস্থা দেখে কান্না পায়, কেননা তারা লাভবান হতে পারল না। যদি এই নিদর্শনগুলো যা তাদের দেখানো হয়েছে, হযরত ঈসা ইবনে মরিয়মের সময়ে ইহুদিদের দেখানো হতো, তবে তারা যেমনটি কুরআন শরীফে বর্ণিত হয়েছে, ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ (সূরা বাকারা-৬২) তারা লাঞ্ছনা ও দারিদ্রের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হতো না। আর যদি লূতের জাতি এই নিদর্শনগুলো প্রত্যক্ষ করত, তবে তারা এক ভয়াবহ ভূমিকম্পের কবলে মাটির নিচে চাপা পড়ত না।

কিন্তু দুর্ভোগ সেসব হৃদয়ের জন্য যেগুলো পাথরের চেয়েও কঠোর প্রমাণিত হয়েছে এবং তাদের হৃদয়ের অন্ধকার অন্য যে কোনো অন্ধকারকে ছাড়িয়ে গেছে। মূল বিষয় হলো, জগত যেখানে পার্থিব প্রতিটি উপকরণে উন্নতি লাভ করেছে, ঠিক একইভাবে কুফর ও অবিশ্বাসের ক্ষেত্রেও উন্নতি করেছে। সুতরাং এই ক্রমবর্ধমান কুফর দাবি জানায়, সাধারণ কোনো আযাব যেন তাদের ওপর অবতীর্ণ না হয়; বরং এমন আযাব অবতীর্ণ হোক যা পৃথিবীর সূচনা থেকে আজ অবধি অবতীর্ণ হয় নি। যাহোক আমরা খোদা তা'লার সহস্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, যে জ্যোতি বিরোধীরা গ্রহণ করে নি এবং অন্ধকারেই রয়ে গেছে, সেই একই জ্যোতি আমাদের দৃষ্টিশক্তি এবং মারেফাত (তত্ত্বজ্ঞান) বৃদ্ধির কারণ হয়েছে।" [হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃ:৩১২]

হাকীকাতুল ওহী পুস্তকে তিনি (আ.) এটি লেখেন। খোদা তা'লা আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মর্ম অনুধাবন করার তৌফিক দান করুন, পাশাপাশি মহানবী (সা.)-এর সত্যনিষ্ঠ দাসের হাতে বয়আত গ্রহণ করে আমাদেরকে প্রকৃত অন্তর্দৃষ্টি এবং মারেফাত (তত্ত্বজ্ঞান) দান করুন। (আমীন)

[আল ফজল-ইন্টারন্যাশনাল, ১৩ ই সেপ্টেম্বর, ২০২৬)



জুমআর খুতবা

আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতার প্রসঙ্গে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবনচরিতের ঈমান উদ্দীপক আলোচনা।

"আমাদের মহানবী হজরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমন পূর্ণাঙ্গরূপে সংসারবিমুখ ও একনিষ্ঠভাবে আল্লাহমুখী ছিলেন, তেমনিভাবে তিনি আল্লাহর ওপর পূর্ণ নির্ভরশীলও ছিলেন। এ কারণেই তিনি এত প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং বিভিন্ন জাতি ও গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সামান্যতম পরোয়াও করেননি এবং তাদের বিরোধিতায় বিন্দুমাত্র প্রভাবিত হননি। আল্লাহ তা'লার সত্তার ওপর তাঁর অসাধারণ ও অলৌকিক পর্যায়ের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এ কারণেই তিনি এত বিশাল দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন, সমগ্র বিশ্বের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং তাদের কোনো গুরুত্বই দেননি। এটি আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতার এক মহান দৃষ্টান্ত, যার তুলনা পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া যায় না।"

(হজরত মসীহ মওউদ (আ.))

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তা'লা যখন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে সমগ্র মানবজাতির জন্য সর্বোত্তম আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তখন তাঁর সত্তায় প্রতিটি সদ্‌গুণ সৃষ্টি করে সেগুলোকে মহত্তম চারিত্রিক গুণে পরিণত করেছিলেন। আর মুমিনদের উপদেশ দিয়েছিলেন যে, তোমরা যদি নিজেদের মধ্যে সৎগুণাবলি সৃষ্টি করতে চাও এবং চরিত্রের উচ্চতম মান অর্জন করতে চাও, তাহলে এই মহান রাসূলের অনুসরণ করো। আর এ অনুসরণই তোমাদের আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম হবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমন আল্লাহ তা'লার নির্দেশ অনুসারে প্রতিটি চারিত্রিক গুণকে সর্বোচ্চ মানে উন্নীত করেছিলেন, তেমনিভাবে মুমিনদেরও উপদেশ দিয়েছিলেন, যেন তারা সেই উচ্চতম মান অর্জনের চেষ্টা করে।

"এ কথাটিও স্মরণ রাখার মতো যে, যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহমুখী হবে, সে-ই আল্লাহর ওপর পূর্ণ নির্ভরশীল হবে। অর্থাৎ, আল্লাহর ওপর পূর্ণ নির্ভরশীল হওয়ার জন্য সম্পূর্ণরূপে আল্লাহমুখী হওয়া শর্ত।" (হজরত মসীহ মওউদ (আ.))

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমরা যদি আল্লাহর ওপর যথাযথভাবে নির্ভর করতে, যেমন তাঁর ওপর নির্ভর করা উচিত, তাহলে তিনি তোমাদেরও জীবিকা দান করতেন, যেমন তিনি পাখিদের জীবিকা দান করেন। তারা সকালে খালি পেটে বাসা থেকে বের হয় এবং সন্ধ্যায় পেট ভরে ফিরে আসে।" (হাদিসে নববি)

আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতার অর্থ হলো, নিজের কাছে যা কিছু রয়েছে, তার চেয়েও অধিক দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ তা'লা আমার প্রয়োজন পূরণ করবেন। আমার কাছে থাকা কিছু জিনিস নষ্ট হয়ে যেতে পারে, কিন্তু আল্লাহ তা'লার কাছে যা রয়েছে, তা কখনো নষ্ট হয় না। আর প্রয়োজন অনুসারে আল্লাহ তা'লা তাঁর ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তিকে এবং সৎকর্মশীল ব্যক্তিকে দান করতে থাকেন।

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬, এর জুমুআর খুতবা (৪ তবুক, ১৪০৫ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আল্লাহ্‌তা'লা মহানবী (সা.)-কে যখন পরিপূর্ণ মানব হিসেবে সৃষ্টি করে সমগ্র মানবজাতির জন্য সর্বোত্তম আদর্শ বানিয়েছেন, তখন তাঁর মাঝে প্রতিটি উত্তম চরিত্র সৃষ্টি করে সেটিকে 'খুলুকে আযীম' বা সুমহান চরিত্রে পরিণত করেছেন এবং মু'মিনদের উপদেশ দিয়েছেন, তোমরা যদি নিজেদের মাঝে পুতঃপবিত্র গুণাবলি সৃষ্টি করতে চাও এবং নৈতিকতার সর্বোচ্চ মান অর্জন করতে চাও, তাহলে এই মহান রসূলের অনুসরণ করো, আর এটিই তোমাদের জন্য খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম হবে। মহানবী (সা.) যেখানে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ অনুযায়ী (নিজের) প্রত্যেক নৈতিক গুণকে সর্বোত্তম মানে উপনীত করেছেন, সেখানে মু'মিনদেরও এই উপদেশ দিয়েছেন, (তোমরা) এর সর্বোচ্চ মান অর্জনের চেষ্টা করো।

আজকাল যেহেতু তাঁর (সা.) পবিত্র জীবনচরিতের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, এরই ধারাবাহিকতায় আজ আমি 'তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ্' বা আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভরতা সম্পর্কে তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক, তাঁর মর্যাদা, মু'মিনদের প্রতি তাঁর উপদেশ এবং তাঁর নিজের আমল বা ব্যবহারিক আদর্শ সম্পর্কে আলোচনা করব।

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন সূত্রে ও বিভিন্ন স্থানে তাওয়াক্কুল বা খোদানির্ভরতা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। এক স্থানে তাঁকে (সা.) সম্বোধন করে আল্লাহ্? তা'লা বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٤٦﴾ وَدَاعِيًا إِلَى اللّٰهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿٤٧﴾ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيرًا ﴿٤٨﴾ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللّٰهِ وَكِيلًا (الاحزاب:46تا49)

অর্থাৎ, হে নবী! নিশ্চয় আমরা তোমাকে প্রেরণ করেছি জগতের জন্য তত্ত্বাবধায়ক, মু'মিনদের সুসংবাদদাতা এবং কাফিরদের জন্য সতর্ককারীরূপে। আর আল্লাহ্‌র নির্দেশে তাঁর প্রতি আহ্বানকারী এবং এক প্রদীপ্ত সূর্য হিসেবে প্রেরণ করেছি। আর মু'মিনদের সুসংবাদ দাও যে, তারা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মহা কৃপা লাভ করবে। আর কাফির ও মুনাফিকদের কথা কখনোই মেনো না এবং তাদের কষ্টদেয়াকে উপেক্ষা করো। আর সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র ওপর তাওয়াক্কুল বা নির্ভর করো, আর কার্যনির্বাহীক হিসেবে আল্লাহ্-ই যথেষ্ট। (সূরা আল-আহযাব :৪৬-৪৯)

অতএব, এটি যেখানে তাঁর (সা.) জন্য একটি সুসংবাদ, সেখানে মু'মিনদের জন্যও সুসংবাদ, যদি তারা ঈমানের ওপর অবিচল থাকে, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলি মেনে চলে এবং আল্লাহ্ তা'লার সত্তার ওপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল বা আস্থা রাখে, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্যও প্রত্যেক বিপদে যথেষ্ট হবেন।

এরপর মু'মিনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই, আর মু'মিনদের আল্লাহ্‌র ওপরই নির্ভর করা উচিত। (সূরা আত্-তাগাবুন :১৪) অতএব, (তারা) যদি আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের দায়িত্ব পালন করে এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভরসা করে, তাহলে তারা নিদর্শনাবলিও দেখতে পাবে। যার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত আমরা মহানবী (সা.)-এর সত্তায় দেখতে পাই এবং তাঁর বদৌলতে তাঁর সাহাবীরা (রা.) এর দ্বারা (আধ্যাত্মিক) কল্যাণ লাভ করেছে এবং আমাদের সামনে বিভিন্ন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর জীবনের ঘটনাবলির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এ বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট, প্রাঞ্জল ও উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হয় যে, মহানবী (সা.) এমন এক সর্বোচ্চ স্তরের মানুষ যার ভেতর বাইর ছিল অভিন্ন, যিনি স্বচ্ছ হৃদয়ের অধিকারী, খোদার জন্য জীবন বাজি রাখার চেতনায় উজ্জীবিত এবং সৃষ্টিকুলের ভয় ও তাদের প্রতি আশা-আকাঙ্ক্ষা রাখা হতে সম্পূর্ণরূপে বিমুখ আর কেবল খোদার ওপরই আস্থাশীল ছিলেন। নবীদের (জীবনের) ঘটনাবলিতে এমন বিপদসংকুল পরিস্থিতি দেখা দেয়া আবার খোদার ওপর ভরসা করে প্রকাশ্যে শিরক ও সৃষ্টিপূজা থেকে এভাবে বারণকারী এবং এতো শত্রু সত্ত্বেও এমন অবিচল ও দৃঢ়পদ অন্য একজনও প্রমাণিত নয়।" [বারাহীনে আহমদীয়া, ৪র্থ ভাগ, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১১-১১২]

তিনি (আ.) আরও বলেছেন, নবীদের মর্যাদাও অনেক উন্নতমানের, কিন্তু মহানবী (সা.)-এর খোদা নির্ভরতার যেসব দৃষ্টান্ত রয়েছে, সেসব দৃষ্টান্ত তাদের জীবনেও পাওয়া যায় না।

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, "তবাত্তুল অর্থাৎ খোদা তা'লাকে ভালবেশে এবং জগতকে পরিত্যাগ করা, এর বাস্তব দৃষ্টান্ত হলেন আমাদের পয়গম্বর (সা.)। কারো প্রশংসার প্রতিও তাঁর কোনো ভ্রুক্ষেপ ছিল না, আর তিরস্কারের প্রতিও নয়। হেন কোন কষ্ট নেই যার তিনি সম্মুখীন হননি, কিন্তু কোনো ভ্রুক্ষেপই করেননি। কোনো লোভ বা প্রলোভন তাঁকে (সা.) সেই কাজ থেকে বিরত রাখতে পারেনি যা তিনি (সা.) খোদার পক্ষ থেকে করতে এসেছিলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ নিজের মাঝে এই অবস্থা পর্যবেক্ষণ না করে এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত (তার) কখনও নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়।" তিনি (আ.) এই উপদেশ দিয়েছেন, এই মর্যাদা অর্জনের জন্য চেষ্টা করা উচিত। নিশ্চিন্ত না হয়ে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভরসা কর এমন উচ্চ মানে উপনীত হওয়া উচিত যেখানে কেবল আল্লাহ্ তা'লার সত্তাই দৃষ্টিপটে থাকবে।

তিনি (আ.) আরও বলেন, "অতঃপর এ বিষয়টিও স্মরণ রাখার যোগ্য যে, যে ব্যক্তি 'মুতাবাত্তিল' হবে, সে 'মুতাওয়াক্কিল' (তথা আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভরশীল)ও হবে। অর্থাৎ মুতাওয়াক্কিল হওয়ার জন্য মুতাবাত্তিল হওয়া শর্ত।"

অর্থাৎ যদি আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভর করতে হয়, তাহলে এর জন্য শতভাব আল্লাহ তা'লাতে মনোনিবেশ করাও আবশ্যক। কেননা, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যদের সাথে এমন সম্পর্ক থাকে অর্থাৎ তাদের ওপর ভরসা ও নির্ভর করা হয়, ততক্ষণ একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা কীভাবে হতে পারে? যখন কেউ সম্পূর্ণরূপে খোদার হয়ে যায় তখন জগতের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে এবং খোদার সাথে সংযুক্ত হয়ে যায়। আর এটি তখনই সম্ভব যখন পূর্ণ খোদা ভরসা থাকে।

যেভাবে আমাদের সম্মানিত নবী (সা.) পূর্ণরূপে খোদাতে নিবেদিত ছিলেন, তেমনি তিনি পূর্ণরূপে খোদার প্রতি নির্ভরশীলও ছিলেন। আর এ কারণেই এতো প্রতাপশালী এবং বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর নেতাদের প্রতিও তিনি বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করেননি এবং তাদের বিরোধিতায় তিল পরিমাণও প্রভাবিত হননি। খোদা তা'লার সত্তায় তাঁর এক অসাধারণ বিশ্বাস ছিল, আর এ কারণেই এতো বিশাল ও সুমহান বোঝাকে তিনি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন এবং সমগ্র বিশ্বের বিরোধিতাও এবং তাদের অস্তিত্বকে কিছুই মনে করেননি। এটি খোদানীর্ভরতার এমন এক মহান দৃষ্টান্ত যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে দেখা যায় না।

কারণ এতে খোদাকে ভালোবেশে জগতকে বিরোধী বানিয়ে ফেলা হয়। কিন্তু খোদাকে দেখতে না পাওয়া পর্যন্ত এই অবস্থা সৃষ্টি হয় না। যতক্ষণ এই প্রত্যাশা না থাকে যে, এরপর দ্বিতীয় দরজা খুলতে যাচ্ছে। যখন এই প্রত্যাশা ও বিশ্বাস জন্মে, তখন সে খোদার পথে আত্মীয়স্বজনকেও শত্রুতে পরিণত করে নেয়। কারণ সে জানে, খোদা তাকে আরও বন্ধু মিলিয়ে দেবেন। সে ভূ-সম্পত্তি হারিয়ে ফেলে, কারণ এর চেয়ে উত্তম কিছু পাওয়ার বিশ্বাস (তার) থাকে।

সারকথা হলো, খোদার সন্তুষ্টিকে অগ্রগণ্য করাই হলো তাবাত্তুল আর তাবাত্তুল এবং তাওয়াক্কুল যমজ।"

অর্থাৎ একে অপরের সাথে যুক্ত। "তাবাত্তুলের রহস্যই হলো তাওয়াক্কুল এবং তাওয়াক্কুলের শর্ত হলো তাবাত্তুল। এ এটিই আমাদের রীতি।"

[মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩০২]

আল্লাহ্ তা'লার প্রতি যখন সম্পূর্ণরূপে বিনত হবে এবং জগতের ওপর নির্ভরতা দূর করবে, কেবল তখনই প্রকৃত তাওয়াক্কুলের অবস্থা সৃষ্টি হবে।

আর যেমনটি আমি বলেছি এবং আমরা সবাই জানি, এর সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত হলেন আমাদের মনিব ও অভিভাবক হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)। হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"এটি মনে করো না যে, আল্লাহ্ তা'লা দুর্বল, তিনি মহাশক্তিধর সত্তা। যখন কোনো বিষয়ে তাঁর প্রতি ভরসা করবে, তিনি অবশ্যই তোমাদের সাহায্য করবেন। وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (সূরা আত্-ত্বালাক :৪) আর কেউ যদি আল্লাহ্ তা'লার ওপর নির্ভর করে, আল্লাহ্-ই তার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু যারা এসব আয়াতের প্রথম সম্বোধিত ছিলেন, তারা ছিলেন ধর্মপরায়ণ। তাদের যাবতীয় চিন্তাভাবনা কেবল ধর্মীয় বিষয় কেন্দ্রিক ছিল এবং তাদের জাগতিক বিষয়াদি খোদার হাতে সমর্পিত ছিল। এজন্য আল্লাহ্ তা'লা তাদের আশ্বস্ত করেছেন যে, আমি তোমাদের সাথে আছি।

বস্তুত, তাকওয়ার বরকতগুলোর মধ্যে একটি হলো, আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকিকে এমন সব বিপদ থেকে মুক্তি দান করেন যা ধর্মীয় বিষয়াদির প্রতিবন্ধক।

একইভাবে আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকিকে বিশেষভাবে রিযিক দান করেন। এখানে আমি আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা মারেফাতের রিযিকের কথা উল্লেখ করব।" তিনি (আ.) বস্তুগত রিযিকের কথা বলছেন না, তত্ত্বজ্ঞানের রিযিকের কথা বলছেন। মহানবী (সা.)-এর উম্মী হওয়া সত্ত্বেও সমগ্র বিশ্বের মোকাবিলা করার ছিল, যার মাঝে আহলে কিতাব, দার্শনিক, উচ্চপর্যায়ের পিপাসু মানুষ এবং আলেম-ফাযেলরা অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু তাঁকে (সা.) এতো অধিক আধ্যাত্মিক রিযিক প্রদান করা হয়েছিল যে, তিনি সবার ওপর বিজয়ী হয়েছিলেন এবং তাদের সবার ভুলত্রুটি বের করেছিলেন। এটি এমন এক আধ্যাত্মিক রিযিক ছিল, যার কোনো দৃষ্টান্ত নেই।" [মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১]

এ বিষয়ে হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যদি তোমরা আল্লাহ্‌?র ওপর সত্যিকার অর্থে নির্ভর কর তবে অবশ্যই তোমাদের সেভাবে রিযিক দেওয়া হবে যেভাবে পাখিদের দেওয়া হয়।" এখানে জাগতিক রিযিকের বিষয়েও তিনি (সা.) বলেছেন। "তারা সকালে খালি পেটে বের হয় এবং সন্ধ্যায় ভরা পেটে ফিরে আসে।"

[সুনান আত তিরমিযি, আবওয়াবুয যোহদ, হাদীস-২৩৪৪]

হযরত আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেছেন,

"দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্তি মানে হালালকে হারাম করে নেওয়া নয়, আর সম্পদ বিনষ্ট করাও নয়। সম্পদের প্রতি কোনো নিরাসক্তির অর্থ এই নয় যে যেসব জিনিস বৈধ সেগুলোকেও অবৈধ বলে দিল। আমরা তো এসব মানি না কিন্তু আধুনা কিছু পীর-ফকিরের রীতি। বরং দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি হলো, তোমার দুই হাতে যা আছে, তা যেন আল্লাহ্‌?র হাতে যা আছে তার চেয়ে তোমার কাছে অধিক নির্ভরযোগ্য না হয়।"

এটিই হলো অনাসক্তি যে, তোমার কাছে নিজের যে সম্পদ রয়েছে এবং তোমার অধিকারভুক্ত রয়েছে, তার চেয়ে যেন এ কথার ওপর বেশি বিশ্বাস থাকে যে আল্লাহ্‌?র কাছে যা আছে তা থেকে আমি বেশি লাভবান হবো। আর বিপদের কারণে পুণ্যের ভাগী হওয় সম্পর্কে তোমরা যেন এমন হও যে, যখন তোমাদের ওপর কোনো বিপদ আসে, তখন তোমরা সেটি হতে উদ্ভূত কল্যাণের প্রতি এভাবে আগ্রহী থাকবে যে, হায়! এটি যদি তোমাদের জন্য স্থায়ী হয়ে যেতো।

[সুনান আত তিরমিযি, আবওয়াবুয যোহদ, হাদীস-২৩৪০]

সুতরাং এটিই হলো তাওয়াক্কুল যে, নিজের কাছে থাকা বস্তুর চেয়ে এ কথার ওপর বেশি বিশ্বাস থাকবে যে, আল্লাহ্ তা'লা আমার প্রয়োজন পূর্ণ করবেন। আমার কিছু জিনিস হয়তো নষ্ট হয়ে যেতে পারে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার কাছে যা আছে তা কখনও নষ্ট হয় না, আর তাওয়াক্কুলকারী এবং নেক আমলকারী প্রয়োজন অনুযায়ী নিরবচ্ছিন্নভাবে তা পেতে থাকে।

হযরত আমর বিন আস (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আদম সন্তানের হৃদয় থেকে প্রতিটি উপত্যকার দিকে একটি পথ বের হয়। যে ব্যক্তির হৃদয় এর সবকটি পথের অনুসরণ করে, আল্লাহ্ তাকে কোন্ উপত্যকায় পরিচালিত করবেন বা ধ্বংস করবেন তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌?র ওপর তাওয়াক্কুল করে, তবে বিভিন্ন পথে চলার ক্ষেত্রে আল্লাহ্-ই তার জন্য যথেষ্ট হবেন।[সুনান ইবনে মাজাহ, কিতাবুয যোহদ, হাদীস-৪১৬৬]

এই হাদীসের যে ব্যাখ্যা রয়েছে, তাতে লেখা আছে যে, এর অর্থ হলো- যে ব্যক্তি নিজ অন্তরকে কেবল বিভিন্ন কামনাবাসনা চিন্তাভাবনা ও জাগতি দুশ্চিন্তার অধীনে রাখে এবং সব দিকে তার মনোযোগ বিক্ষিপ্ত থাকে, সে কোনো উপত্যকায় গিয়ে ধ্বংস হয় সেবিষয়ে আল্লাহ্ তা'লার কোনো মাথাব্যথা থাকে না সে কোন্ প্রান্তরে গিয়ে ধ্বংস হয়, কোথায় বাঁচে আর কোথায় মরে- আল্লাহ্‌র এর কোনো পরোয়া থাকে না।'ওয়া মান ইয়াতাওয়াক্কাল আলাল্লাহ্' অর্থাৎ যে আল্লাহ্‌র প্রতি বিনত হয়, আল্লাহ্ তা'লা তার বিভিন্ন ও বিক্ষিপ্ত প্রয়োজন, দুশ্চিন্তা ও অভাবের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং সেগুলো পূরণ করে দেন। এই অর্থের সমর্থন এই রেওয়ায়েত থেকেও পাওয়া যায় যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার সমস্ত চিন্তাকে একটিমাত্র চিন্তায় পরিণত করে, অর্থাৎ ধর্মীয় চিন্তায় পরিণত করে, দ্বীনের চিন্তায় রূপান্তরিত করে; সে যেন দেখে তার ধর্ম কী, আল্লাহ্ তা'লার সাথে তার সম্পর্ক কেমন তা যেন দেখে, নিজের আধ্যাত্মিক অবস্থা কেমন তা যেন দেখে, তবে আল্লাহ্ তা'লা ইহ ও পরকালে তার অন্য সকল চিন্তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। [মিরকাতুল মাফাতিহ, ৯ম খণ্ড, ৪৯৮]

এই হাদীসের এটিই অর্থ।

মহানবী (সা.) কত সূক্ষ্মভাবে আল্লাহ্ তা'লার ওপর তাওয়াক্কুল বা নির্ভরতাকে সামনে রেখে নিজের দৈনন্দিন বিষয়াদির জন্য দোয়া করতেন! হযরত উম্মে সালামা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখন নিজের বাড়ি থেকে বের হতেন, তখন বলতেন

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَعُوذُبِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَّ أَوْ نَضِلَّ أَوْ نَظْلِمَ أَوْ نُظْلَمَ أَوْ نَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا۔

"আল্লাহ্‌র নামে, আমি আল্লাহ্‌র ওপর তাওয়াক্কুল করি। হে আল্লাহ্! আমরা তোমার আশ্রয় চাই এ থেকে যে, আমরা পদস্খলিত হব বা আমরা পথভ্রষ্ট হব, অথবা আমরা অন্যায় করব বা আমাদের ওপর অন্যায় করা হবে, অথবা আমরা মূর্খতাসুলভ আচরণ করব বা আমাদের সাথে মূর্খতাসুলভ আচরণ করা হবে।"

একইভাবে আরও একটি রেওয়ায়েত রয়েছে। হযরত বুরায়দা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখন নিজ গৃহ থেকে বাইরে বের হতেন, তখন বলতেন:

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ۔ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اُضَلَّ اَوْ اَزِلَّ اَوْ اُزَلَّ اَوْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ اَوْ اَبْغِيَ اَوْ يُبْغٰى عَلَيَّ۔]

"আল্লাহ্‌র নামে (বের হচ্ছি), আমি আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করলাম। আর আল্লাহ্‌র তৌফিক বা কৃপাতেই পুণ্য করার শক্তি এবং মন্দ থেকে বাঁচার সামর্থ্য অর্জিত হয়। হে আল্লাহ্! আমি তোমার আশ্রয় চাই এ থেকে যে, আমি পথভ্রষ্ট হব বা আমাকে পথভ্রষ্ট করা হবে; আমি পদস্খলনের শিকার হব বা আমাকে পদস্খলনে ফেলা হবে; আমি কারো ওপর অন্যায় করব বা আমার ওপর অন্যায় করা হবে; আমি মূর্খতায় লিপ্ত হব বা আমার সাথে মূর্খতাসুলভ আচরণ করা হবে; এবং আমি কারো সাথে বাড়াবাড়ি করব বা আমার বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করা হবে।" [কুনযুল উম্মাল, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৫৪, হাদীস-১৮৪১৬]

সবগুলো বিষয় এর মাঝে চলে এসেছে, এতে সবকিছুরই পরিবেষ্টন হয়ে গেছে।

একইভাবে গৃহে প্রবেশের দোয়ারও উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত আবু মালেক আশআরি (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, যখন কোনো ব্যক্তি তার গৃহে প্রবেশ করে, তখন তার বলা উচিত:

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

"হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে গৃহে প্রবেশের কল্যাণ প্রার্থনা করি এবং ঘর থেকে বের হওয়ার কল্যাণ প্রার্থনা করি। আল্লাহ্‌র নামে আমরা প্রবেশ করি এবং আল্লাহ্‌র নামেই আমরা বের হই। আর আল্লাহ্‌র ওপর, যিনি আমাদের প্রভু-প্রতিপালক, আমরা তাওয়াক্কুল করি।" এরপর সে যেন তার গৃহবাসীদের সালাম দেয়। অর্থাৎ সে যেন প্রথমে এই দোয়া পড়ে এবং তারপর গৃহে প্রবেশ করে বাড়ির লোকদের সালাম দেয়।

[সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব, হাদীস-৫০৯৬]

এরপর তাঁর (সা.) তাওয়াক্কুল এবং খোদা তা'লাকে ভয় করা সংক্রান্ত একটি রেওয়ায়েত রয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক এই রেওয়ায়েতটি বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) হযরত বিলাল (রা.)-র নিকট গমন করেন। মহানবী (সা.) তাঁর কাছে খেজুরের একটি স্তূপ দেখে বলেন,

"হে বিলাল! এগুলো কী?" হযরত বিলাল (রা.) নিবেদন করেন, "এগুলো কিছু খেজুর যা আমি আপনার (সা.) জন্য জমিয়ে রেখেছি।"

তিনি (সা.) বলেন, "হে বিলাল, তোমার জন্য আক্ষেপ! তোমার কি এই ভয় নেই যে, কিয়ামতের দিন জাহান্নামে এর ধোঁয়া উঠবে? অর্থাৎ তা শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। হে বিলাল! খরচ করো এবং আরশের মালিকের পক্ষ থেকে অভাব-অনটনের ভয় কোরো না। [আল মুজামুল আওসাত,৩য় ভাগ, পৃ: ৮৬, হাদীস: ২৫৭২] তাঁর ওপর ভরসা করো।"

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ প্রসঙ্গে বলেন, মানুষের ঈমানে তখনই উন্নতি সাধিত হতে পারে যখন সে খোদা তা'লার নির্দেশের ওপর পরিচালিত হয় এবং খোদার ওপর নিজের ভরসা বা আস্থা বলবৎ রাখে। একবার মহানবী (সা.) বিলাল (রা.)-কে দেখেন যে তিনি কিছু খেজুর জমা করছেন। তিনি (সা.) বলেন, কিসের জন্য এমন করছ? তিনি (বিলাল) বলেন, আগামীকালের জন্য জমা করছি। তিনি (সা.) বলেন, তুমি কি আগামীকালের খোদার প্রতি বিশ্বাস রাখো না? যে খোদা আজ তোমাকে দিচ্ছেন তিনি কি আগামীকাল তোমাকে দেবেন না, এর প্রতি কি তোমার ঈমান নেই? কিন্তু তিনি (আ.) একথাও বলেছেন এবং স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এর অর্থ এমন নয় যে, কেবল অপচয় করতে থাকবে; কিছু মানুষের হাত খোলা থাকে এবং তারা (সঞ্চয়) করে না। তিনি (আ.) বলেন, কিন্তু এই কথাটি তিনি (সা.) বিলালকে বলেছিলেন, প্রত্যেককে বলেননি এবং প্রত্যেককে তার সহ্যক্ষমতা অনুযায়ী উপদেশ দেওয়া হয়। " [মালফুযাত, ৯ম খণ্ড-পৃ:২১০]

তিনি (আ.) বলেন, এই উপদেশটি অবশ্যই মহানবী (সা.)-এর ব্যাপারে, কারণ হাদীসে স্পষ্টরূপে এসেছে, মহানবী (সা.)-এর ব্যাপারেই সে বলেছিল যে, আপনার জন্য জমা করছি, তখন তিনি (সা.) বলেছিলেন, আমার তো তাঁর (খোদার) প্রতি ভরসা রয়েছে, এর ধোঁয়া তো [আমার কাছেই পৌঁছাবে যদি তা আমার জন্য রাখা হয়ে থাকে। কিন্তু কিছু মানুষকে এবং পবিত্র কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী এই উপদেশও দেওয়া হয়েছে যে, এতটা অপচয় কোরো না যে, আর কিছুই থাকবে না; বরং কিছুটা পার্থিব উপায়-উপকরণেরও ব্যবস্থা করো এবং তারপর আল্লাহ্? তা'লার ওপর তাওয়াক্কুলও করো যেন তিনি এসব উপকরণকে সুরক্ষিত রাখেন এবং সেগুলো থেকে কল্যাণ লাভ করার তৌফিক দান করেন।

তাওয়াক্কুল বা ভরসা করার অর্থ এটি নয় যে, সতর্কতা অবলম্বন করা হবে না এবং উপকরণ ব্যবহার করা হবে না। এটিও ইসলামী শিক্ষা পরিপন্থি।

যেমন, হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, একজন নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমি কি উটের হাঁটু বেঁধে এরপর তাওয়াক্কুল করবো, নাকি সেটিকে খোলা ছেড়ে দিয়ে তাওয়াক্কুল করবো। তিনি (সা.) বলেন, সেটির হাঁটু বাঁধো এরপর তাওয়াক্কুল করো।

[সুনান তিরমিযি, আবওয়াব সিফাতুল কিয়ামাহ, হাদীস-২৫১৭]

এটি একটি দৃষ্টান্ত, অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করা যেতে পারে। রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) এমনটি তখন বলেছিলেন যখন একজন বেদুইন অথবা এক রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত আমর বিন উমাইয়া (রা.) নিজের উটনীটি মহানবী (সা.)-এর মসজিদের দরজায় খোলা ছেড়ে দেন এবং নামাযের জন্য ভেতরে চলে যান।

[আল জামি লি শো'বিল ঈমান, ২য় খণ্ড, পৃ:৪২৭]

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর বিশদ বিবরণ এভাবে বর্ণনা করেছেন,

"মানুষের উচিত তাকওয়াকে হাতছাড়া না করা আর খোদার প্রতি ভরসা করা। তাহলে তার কোনো প্রকার কষ্ট হতে পারে না। খোদার প্রতি ভরসা করার অর্থ এমন নয় যে, মানুষ বাহ্যিক চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা ছেড়ে দেবে। বরং এর অর্থ হলো, ষোলোআনা চেষ্টা-প্রচেষ্টা করার পর পরিণাম খোদার হাতে ছেড়ে দেওয়া, আর এর নামই তাওয়াক্কুল। যদি সে বাহ্যিক চেষ্টা-প্রচেষ্টা না করে এবং শুধু তাওয়াক্কুল করে তাহলে তার তাওয়াক্কুল অন্তঃসারশূন্য। আর যদি শুধুমাত্র বাহ্যিক চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে তার প্রতি ভরসা করে যে, আমি বাহ্যিক উপকরণ ব্যবহার করেছি, এটিই যথেষ্ট; আল্লাহ্র প্রতি ভরসা করার প্রয়োজন নেই, এবং খোদার প্রতি তাওয়াক্কুল না করে, তাহলে সেই বাহ্যিক চেষ্টা-প্রচেষ্টাও অন্তঃসারশূন্য। সেই চেষ্টা-প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে যাবে। একজন উটের ওপরে আরোহিত ছিল এবং মহানবী (সা.)-কে দেখে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নিচে নামে এবং তাওয়াক্কুল করার সংকল্প করে, কিন্তু বাহ্যিক উপকরণ ব্যবহার করবে না। সেমতে, সে নিজের উটের হাঁটু বাঁধে নি। মহানবী (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে আসার পর দেখে, তার উটটি নেই। ফেরত এসে সে মহানবী (সা.)-এর কাছে অভিযোগ করে যে, আমি ভরসা করেছিলাম কিন্তু আমার উট হারিয়ে গেছে। তিনি (সা.) বলেন, তুমি ভুল করেছ। প্রথমে উটের হাঁটু বেঁধে এরপর তাওয়াক্কুল করলে সেটি সঠিক হতো। "

[মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৫৮-৫৯]

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর কাছে কিছু দিনার আসে। তিনি (সা.) ছয়টি দিনার ছাড়া সবগুলো বিতরণ করে দেন। সেগুলো তিনি তাঁর পবিত্র সহধর্মিনীদের মাঝে একজনের কাছে গচ্ছিত রাখেন। আরেকটি রেওয়ায়েতে আছে, মহানবী (সা.) নিজের অন্তিম অসুস্থতার সময় হযরত আয়েশা (রা.)-র বুকের সাথে হেলান দিয়ে বসেছিলেন, তখন তিনি (সা.) বলেন, হে আয়েশা! সেই স্বর্ণের দিনারগুলো কোথায়? হযরত আয়েশা (রা.) নিবেদন করেন, সেগুলো আমার কাছে রক্ষিত আছে। তিনি (সা.) বলেন, সেগুলো আল্লাহ্র পথে ব্যয় করো। এরপর রোগের তীব্রতার কারণে মহানবী (সা.) অচেতন হয়ে পড়েন। [সেগুলো গচ্ছিত রাখার কারণ ছিল, যেন কোনো সময়ে সেগুলো বিতরণ করতে পারেন।] তখন মহানবী হযরত আয়েশা (রা.)-র বুকের সাথে হেলান দিয়ে ছিলেন, যখন মহানবী (সা.) কিছুটা আরোগ্য বোধ করেন তখন তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, হে আয়েশা! সেই স্বর্ণের দিনারগুলো কি খরচ করে ফেলেছ? তিনি নিবেদন করেন, না; আল্লাহ্র কসম! হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! এখনো করিনি। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি (সা.) সেই দিনারগুলো আনান, যখন সেগুলো নিয়ে আসা হয় তখন তিনি (সা.) সেগুলো নিজের হাতের তালুতে রেখে গুণে দেখেন ছয়টি দিনার ছিল। তিনি (সা.) বলেন, মুহাম্মদের নিজের প্রভুর প্রতি কেমন তাওয়াক্কুল হবে, যদি খোদার সাথে সাক্ষাৎ আর পৃথিবী থেকে বিদায় বেলায় এই দিনারগুলো তাঁর কাছে থেকে যায়। অতঃপর মহানবী (সা.) সেসব দিনার আল্লাহ্র পথে সদকা করে দেন এবং সেদিনই তাঁর (সা.)-এর মৃত্যু হয়। [আত্তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খন্ড, পৃ: ১৮২-১৮৩]

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلٰىنَا ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ, তুমি (তাদের) বলে দাও, আমাদের কাছে তাই পৌঁছায় যা আল্লাহ্ আমাদের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন, তিনিই আমাদের অভিভাবক। আর আল্লাহ্র ওপরই মুমিনদের ভরসা করা উচিত। [সুরা তওবা, আয়াত:৫১]

মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শে আমরা দেখি যে, তিনি (সা.) কীভাবে এক স্থানে আল্লাহ্র প্রতি ভরসার এক সুমহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ রয়েছে তাঁর প্রতি ভরসা করার, তিনি (সা.) স্বয়ং কীভাবে এর ওপর আমল করতেন। যখন মুসায়লামা কাযযাব নিজের সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাঁর (সা.) আনুগত্য করার ঘোষণা দেয়, কিন্তু সাথে শর্ত জুড়ে দেয়। তখন তিনি (সা.) বলেন, কোনো শর্ত গ্রহণ করা হবে না বরং [তিনি (সা.) তা] কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, তিনি (রা.) বলেন, মুসায়লামা কাযযাব মহানবী (সা.)-এর যুগে আসে এবং বলে, যদি মুহাম্মদ (সা.) তাঁর পর আমাকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করে, তাহলে আমি তাঁর অনুসারী হবো। আর সে মদীনায় তার সৈন্যবাহিনীসহ, অনেক লোকজন সাথে নিয়ে এসেছিল। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, তার সঙ্গে এক লক্ষ মানুষ ছিল। অর্থাৎ তার অনুসারী ছিল। হয়তো (এর চেয়ে) কমই এসে থাকবে। মহানবী (সা.)-তার কাছে যান। তাঁর (সা.)-এর সাথে হযরত সাবেত বিন কায়েস শিম্মাস (রা.) ছিলেন। মহানবী (সা.)-এর হাতে একটি খেজুরের ডাল ছিল। মহানবী (সা.) যখন মুসায়লামা কাযযাবের সামনে এসে দাঁড়ান, সে তখন তার সাথীদের সাথে বসা ছিল, তাঁকে (সা.) দেখে সে দাঁড়িয়ে যায়। তিনি (সা.) বলেন, তুমি আমার কাছে এই শাখাটি দাবি করলেও আমি তোমাকে তা দেব না। আর তুই কখনোই আল্লাহ্র সিদ্ধান্তকে অতিক্রম করতে পারবি না, যা তোর জন্য নির্ধারিত আছে। (আর) তুই যদি পিঠ দেখিয়ে চলে যাস, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তোমার পায়ের রগ কেটে দেবেন। আর আমি তোমাকে সেই ব্যক্তি বলেই মনে করছি, যার সম্পর্কে আমাকে স্বপ্নে অনেক কিছু দেখানো হয়েছে। [এর আগে সে এই কথা বলেছিল যে, আপনি আমাকে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করুন।] যাহোক, তিনি (সা.) বলেন, এই ছড়ি বা ডালের সমপরিমাণও তোমাকে দেওয়া হবে না। আমি স্বপ্নে যা দেখেছি, তাই এখন আমি দেখতে পাচ্ছি। আর এ হলো সাবেত। [এখানে সাবেত বলতে কোনো শব্দ নয় বরং সাবেত (রা.) সাহাবী, যিনি মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলেন।] তিনি (সা.) বলেন, এ হলো সাবেত, অর্থাৎ সে আমার প্রতিনিধি সাবেত। যে আমার পক্ষ থেকে তোমাকে উত্তর দেবে। এ কথা বলে তিনি (সা.) তাকে রেখে ফিরে যান। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আমি মহানবী (সা.)-এর উক্তি,'' আমি তোমাকে সেই হিসেবে ব্যক্তি দেখতে পাচ্ছি, যার সম্পর্কে আমাকে স্বপ্নে অনেক কিছু দেখানো হয়েছে। (এ বিষয়ে) হযরত আবু হুরায়রা (রা.) আমাকে বলেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, 'একবার আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। এমন সময় আমি আমার হাতে দুটি সোনার কঙ্কণ দেখতে পাই। এই দৃশ্য আমার ভালো লাগে নি। এরপর স্বপ্নে আমার প্রতি এমর্মে ওহী হয়, আমি যেন সেগুলোর ওপর ফুঁ দেই। এরপর আমি সেগুলোর ওপর ফুঁ দিলে তা উড়ে যায়। আমি দুজন মিথ্যাবাদীকে এর ব্যাখ্যা হিসেবে মনে করি, যারা পরবর্তীতে প্রকাশ পাবে। এদের একজন আনসী, অপর জন হলো মুসায়লামা। [সহীহ আল বুখারি, কিতাবুল মাগাজি, হাদীস-৪৩৭৩-৪৩৭৪]

আসওয়াদ আনসি ও মুসায়লামা-এই দুজনই বিদ্রোহী মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন এবং সেখান থেকে সে সময় চলে গিয়েছিলেন। পরে হজরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতের সময় তাঁরা যুদ্ধও করেছিলেন।

হজরত মসীহে মওউদ (রা.)-এর পুত্র হজরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে লিখেছেন যে,

"রসুলে করিম (সা.) কোনো কাজেই দুনিয়া ও দুনিয়ার মানুষের প্রতি মনোযোগ দিতেন না। পার্থিব উপায়-উপকরণের দিকে তিনি চোখ তুলে পর্যন্ত তাকাতেন না; বরং প্রতিটি কাজেই তাঁর দৃষ্টি আল্লাহ্‌তা'লার দিকেই নিবদ্ধ থাকত যে, তিনিই সবকিছু করবেন। অর্থাৎ, তিনি ছিলেন তাওয়াক্কুলের এক পূর্ণাঙ্গ আদর্শ, যার দৃষ্টান্ত পূর্ববর্তী নবীদের মধ্যেও পাওয়া যায় না এবং তাঁর পরেও তাঁর মতো তাওয়াক্কুলকারী কোনো মানুষ জন্মগ্রহণ করেননি।"

এ প্রসঙ্গে ইতিহাস আমাদের জানায় যে, "মুসায়লামা রসুলে করিম (সা.)-এর জীবদ্দশায় এক বিশাল সৈন্যদল নিয়ে মদিনায় তাঁর কাছে এসেছিল এবং তাঁর কাছে এই আবেদন জানিয়েছিল যে, তিনি যদি তাঁর পর তাকে খলিফা নিযুক্ত করেন, তাহলে সে তার সম্প্রদায়সহ তাঁর আনুগত্যগ্রহণ করবে এবং ইসলামের অনুসরণ করবে। ইসলামের তৎকালীন অবস্থা এমন ছিল যে, ইসলাম তখন দুর্বল অবস্থায় ছিল।" অর্থাৎ, তখন ইসলামের দুর্বল অবস্থার কারণে তিনি চাইলে এই উপায় অবলম্বন করে তার সাহায্য গ্রহণ করতে পারতেন। "কিন্তু সেই পবিত্র সত্তা, যাঁর আল্লাহ্‌তা'লার শক্তির ওপর পূর্ণ আস্থা ও তাওয়াক্কুল ছিল এবং যিনি মানুষের পরিকল্পনাকে সামান্যতমও পরোয়া করতেন না, তিনি সঙ্গে সঙ্গেই তার আবেদন প্রত্যাখ্যান করলেন।" অর্থাৎ, তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে, এমনটি হতে পারে না।

"হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন রসুলে করিম (সা.)-এর যুগে।" এটি সেই একই হাদিস, যা আমি আগে বর্ণনা করেছি। এখানে সেটিই উদ্ধৃত করা হয়েছে।

"মিথ্যাবাদী মুসায়লামা এসেছিল এবং বলেছিল, 'মুহাম্মদ (সা.) যদি তাঁর পরে আমাকে শাসক নিযুক্ত করেন, তাহলে আমি তাঁর অনুসারী হয়ে যাব।' সে সময় সে তার সম্প্রদায়ের একটি বিশাল দলকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল।

রসুলে করিম (সা.) এ কথা শুনে তার দিকে এগিয়ে গেলেন। হজরত সাবিত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাস (রা.) তাঁর সঙ্গে ছিলেন। আর রসুলে করিম (সা.)-এর হাতে খেজুরগাছের একটি ডালের টুকরা ছিল। তিনি এগিয়ে গিয়ে মুসায়লামার সামনে দাঁড়ালেন। মুসায়লামা তখন তার সঙ্গীদের মাঝে বসে ছিল।

তিনি বললেন, 'তুমি যদি আমার কাছে এই ডালটুকুও চাও, তবুও আমি তোমাকে তা দেব না। আর আল্লাহ্‌ তোমার জন্য যা নির্ধারণ করে রেখেছেন, তুমি তার সীমা অতিক্রম করতে পারবে না। আর যদি তুমি মুখ ফিরিয়ে চলে যাও, তাহলে আল্লাহ্‌তা'লা তোমার দুই গোড়ালি কেটে দেবেন। আর আমি তো তোমাকে সেই ব্যক্তিই মনে করছি, যার সম্পর্কে আমাকে সেই দৃশ্য দেখানো হয়েছে, যা আমি দেখেছি। আর সাবিত (রা.) আমার পক্ষ থেকে তোমাকে উত্তর দেবেন।'

এরপর তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন।

হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, যেমনটি আমি আগেও বলেছি, 'আমি জিজ্ঞাসা করলাম, রসুলুল্লাহ (সা.)-এর এই কথার অর্থ কী-"আমি তো তোমাকে সেই ব্যক্তিই মনে করছি, যার সম্পর্কে আমাকে সেই দৃশ্য দেখানো হয়েছে, যা আমি দেখেছি?'

এর উত্তরে হজরত আবু হুরায়রা (রা.) আমাকে জানালেন যে, রসুলে করিম (সা.) বলেছিলেন, 'একবার আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। তখন আমি দেখলাম, আমার দুই হাতে সোনার তৈরি দুটি বালা রয়েছে। সেগুলো আমার কাছে কিছুটা অপছন্দনীয় মনে হলো। এ অবস্থায় স্বপ্নের মধ্যে আমার প্রতি ওহি অবতীর্ণ হলো যে, আমি যেন সেগুলোর ওপর ফুঁ দিই। আমি যখন ফুঁ দিলাম, তখন বালা দুটি উড়ে গেল। অতঃপর আমি এর ব্যাখ্যা করলাম যে, আমার পরে দুজন মিথ্যাবাদী আবির্ভূত হবে। তাদের মধ্যে একজন হলো আসওয়াদ আনসি এবং অন্যজন মুসায়লামা।'

এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্‌ তা'লার ওপর মহানবী (সা.)-এর কেমন দৃঢ়বিশ্বাস ছিল এবং তিনি খোদা তা'লার সাহায্যের বিষয়ে কতটা নিশ্চিন্ত ছিলেন।

তাঁর চারদিকে কাফিরদের প্রবল প্রতাপ ছিল, যারা সবসময় তাঁকে দুঃখ দিত এবং কষ্ট দেওয়ার কাজে লিপ্ত থাকত। আর সম্ভাব্য সকল উপায়ে তাঁকে কষ্ট দিত। রোম ও পারস্য সম্রাটও তাদের নিজ নিজ শাসকদেরকে তাঁর মোকাবেলার জন্য একের পর এক নির্দেশ পাঠাচ্ছিল। বনু গাসসান যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ইরানিরা এই ক্রমবর্ধমান শক্তিকে ঈর্ষা ও বিস্ময়ের দৃষ্টিতে দেখছিল এবং প্রতিটি সরকার এই নতুন আন্দোলনের ওপর সন্দেহ ও সংশয়ের দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল। এমন সময়ে যতক্ষণ না মহানবী (সা.)-এর চারপাশে এক বিশাল সেনাবাহিনী জড়ো হতো, তাঁর জন্য নিজ শত্রুদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া বাহ্যত কঠিন, বরং অসম্ভব বলে মনে হচ্ছিল। মদীনা মুনাওয়ারা থেকে শুরু করে মক্কা মুকাররমা পর্যন্ত বিজয়গুলো তাঁকে আশেপাশের প্রতিটি সরকারের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। আর দূরদর্শী দৃষ্টিগুলো প্রাথমিক পর্যায়েই এই ক্রমবর্ধমান শক্তিকে ধ্বংস করে দেওয়ার চিন্তায় মগ্ন ছিল। কারণ তাদের বিশ্বাস ছিল যে, এই শক্তি যদি আরও বেশি বৃদ্ধি পায়, তবে তা আমাদের বড় বড় সুরম্য প্রাসাদের প্রতিটি ইট খসিয়ে দেবে।

অতঃপর মহানবী (সা.) এই বিশাল প্রদর্শনীর মোকাবেলায় যে প্রস্তুতিই নিতেন না কেন, তা কম ছিল। মানুষের বুদ্ধি এমন অবস্থায় যেভাবে বন্ধু এবং শত্রুকে নিজের সাথে মেলাতে চায় এবং যেসব কলাকৌশল দ্বারা অন্যদেরও নিজের অন্তর্ভুক্ত করতে চায়, তা ইতিহাস পাঠকদের কাছে সহজেই বোধগম্য হতে পারে। কিন্তু আমার সেই প্রিয় মানুষটি পার্থিব ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন ঐশী সত্তা। ক্রমবর্ধমান সেনাবাহিনী আর ধাবমান অশ্বরাজি, উন্নত বর্শা আর চকচকে তরবারির কোনো পরোয়া তাঁর ছিল না। তিনি আসমানী ফেরেশতাদের অবতরণ দেখছিলেন, আর আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা তাঁর কানে প্রতি মুহূর্তে সান্ত্বনাবাণী শোনাচ্ছিলেন। তাঁর হৃদয় দৃঢ়বিশ্বাসে পূর্ণ এবং বুক ঈমানে পরিপূর্ণ ছিল। সংক্ষেপে, পার্থিব উপায়-উপকরণের ওপর ভরসা করার পরিবর্তে তাঁর তাওয়াক্কুল ছিল খোদার ওপর। অতএব এসব বিপদে তিনি কীভাবে ঘাবড়ে যেতে পারেন! তিনি মুসায়লামা ও তার সেনাবাহিনীর ওপর ভরসা করাকে এক মুহূর্তের জন্যও সমীচীন মনে করেননি। আর পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে, খিলাফতের ধোঁকা দিয়ে তোমাকে নিজের সাথে মেলানো এবং তোমার সম্প্রদায়ের সাহায্য লাভ করা তো দূরে থাক; একটি খেজুরের ডালের বিনিময়েও যদি তোমার সমর্থন লাভ করতে হয়, তাহলে আমি সেদিকে চোখ তুলেও তাকাব না।

এই আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন হৃদয়ের অবস্থার প্রতি মনোযোগ দাও। সেই তাওয়াক্কুলকারী মানুষের মর্যাদার দিকে দৃষ্টি দাও। দৃঢ়বিশ্বাসে পূর্ণ অন্তরের এই অবস্থার অনুভূতি নিজেদের হৃদয়ে সৃষ্টি করে দেখো যে, কেমন দৃঢ়বিশ্বাস এবং তাওয়াক্কুলের বশবর্তী হয়ে তিনি মুসায়লামাকে উত্তর দিচ্ছেন। কোনো রাজা কি এমন পরিস্থিতিতে এরূপ সাহস ও বীরত্ব কাজে লাগাতে পারে? ইতিহাস কি রক্ত-মাংসে গড়া কোনো মানুষকে এমন পরিস্থিতি থেকে এভাবে নিরাপদে বেরিয়ে আসতে দেখাতে পারে? যদি না পারে, তবে এর কারণ কী? এর কারণ কেবল এটাই যে, তাঁর জীবনের সাথে তুলনা করাই ভুল। কারণ, তিনি নবী ছিলেন। যদি তাঁর কোনো তুলনা করা যায়, তবে তা নবীগণের সাথেই হতে পারে। কিন্তু তিনি যে মর্যাদা লাভ করেছেন, তার দৃষ্টান্ত নবীগণের মাঝেও পাওয়া যায় না। কারণ, সমস্ত নবীগণের ওপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। এই স্থানে এটিও স্মরণ রাখা উচিত যে, মুসায়লামাকে উত্তর দেওয়ার সময় রসুল করীম (সা.)-এর এই উদ্দেশ্য ছিল না যে, তিনি (সা.) শাসনক্ষমতার অধিকার নিজ সন্তানদের জন্য সংরক্ষিত রাখতে চেয়েছিলেন। কারণ যদি এমনটি হতো, তবে তাঁর (সা.) প্রত্যাখ্যান আল্লাহ্‌?র ওপর তাওয়াক্কুলের কারণে নয়, বরং স্বীয় সন্তানদের প্রতি ভালোবাসার কারণে সাব্যস্ত হতো। কিন্তু রসুল করীম (সা.) নিজের সন্তানদেরকে তাঁর (সা.) পরে স্থলাভিষিক্ত করেননি, বরং হযরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন। এর থেকে বোঝা যায় যে, তাঁর (সা.) প্রত্যাখ্যান কোনো পার্থিব স্বার্থের জন্য ছিল না, বরং তা ছিল এক অসীম দৃঢ়বিশ্বাসের ফল।

একইভাবে, এটিও স্মরণ রাখা উচিত যে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুসায়লামা কাযযাবের সাহায্য লাভ করা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও ক্ষতিকর ছিল না। কারণ সে যদি এই শর্ত দিত যে, আমি আপনার আনুগত্য এই শর্তে করব যে, আপনি অমুক অমুক ধর্মীয় বিষয়ে আমার কথা মেনে নেবেন, তাহলেও এটি বলা যেতে পারত যে, তিনি (সা.) নিজের কথার জেদ বা পক্ষপাতিত্বের কারণে তার দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন। অর্থাৎ সে যে কথা বলেছিল যে, আমার কথা মেনে নিন, শুধুমাত্র নিজের কথার জেদ বজায় রাখার জন্যই তিনি (সা.) তা অস্বীকার করেছিলেন-কিন্তু সে এমন কোনো কথা বলেনি যার দ্বারা বোঝা যায় যে, সে ধর্মে কোনো পরিবর্তন চেয়েছিল। সুতরাং, তাঁর (সা.) প্রত্যাখ্যান কেবল সেই তাওয়াক্কুল ও দৃঢ়বিশ্বাসেরই ফল ছিল, যা খোদা তা'লার ওপর তাঁর (সা.) ছিল।

আরও একটি কথা স্মরণ রাখার যোগ্য যে, তিনি (সা.) চাইলে সেই সময় মুসায়লামাকে ধরে হত্যা করাতে পারতেন, কারণ সে এক বিশাল দলবল নিয়ে এলেও তখনও মদীনায় ছিল এবং তাঁর (সা.) আয়ত্তের ভেতরে ছিল। কিন্তু এই ব্যাপারেও তিনি (সা.) আল্লাহ্‌ তা'লার ওপর তাওয়াক্কুল করেছিলেন যে, তিনি নিজেই এই কষ্টদানকারীকে ধ্বংস করবেন। اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

এখন আমি নামাযের পর কয়েকটি গায়েবানা জানাযা পড়াব। কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করা হবে, তাদের মধ্যে প্রথম স্মৃতিচারণ হলো মোকাররম মির্যা সফদর মাহমুদ সাহেবের, যিনি মান্ডি বাহাউদ্দিনের বাসিন্দা মোকাররম গোলাম রসুল সাহেবের পুত্র ছিলেন। গত ২রা সেপ্টেম্বর মান্ডি বাহাউদ্দিনে তাঁকে শহীদ করা হয়েছে, اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ। কোনো এক অজ্ঞাত ব্যক্তি পিছু নিয়ে পেছন থেকে গুলি করে তাকে শহীদ করেছে। শাহাদাতের সময় মরহুমের বয়স ছিল ৬৫ বছর।

বিস্তারিত বিবরণ অনুযায়ী, যে দিন এই ঘটনা ঘটে, সেদিন মির্যা সফদর মাহমুদ সাহেব তাঁর ওয়ার্কশপ থেকে মাগরিবের নামায আদায়ের জন্য মোটরসাইকেলে করে রওনা হয়েছিলেন। পথে একটি নির্জন জায়গা পড়ত, সেখান দিয়ে যাওয়ার সময় কোনো এক অজ্ঞাত ব্যক্তি মোটরসাইকেলের পিছু নিয়ে পেছন থেকে গুলিবর্ষণ করে এবং মরহুমের গায়ে তিনটি গুলি লাগে, যার ফলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনার পর হামলাকারী পালিয়ে যায়।

শহীদ মরহুমের পরিবারে আহমদীয়াতের প্রবেশ ঘটেছিল তাঁর নানী, গুজরাত জেলার খারিয়াঁ নিবাসী মোহতরমা হুসাইন বিবি সাহেবার মাধ্যমে। সাধারণত মানুষের পরিবারে পুরুষদের মাধ্যমে আহমদীয়াত প্রবেশ করে, কিন্তু এখানে একজন নারীর মাধ্যমে তাঁদের পরিবারে আহমদীয়াত এসেছিল, যিনি দ্বিতীয় খিলাফতের প্রাথমিক যুগে বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। পরবর্তীতে নানী মোহতরমা হুসাইন বিবি সাহেবার প্রেরণা ও তবলীগের ফলে শহীদ মরহুমের দাদা মোকাররম নবাব দীন সাহেব, যিনি তাঁদের পারস্পরিক আত্মীয় ছিলেন, তিনিও বয়আত করে নেন। শহীদ মরহুম নিজ এলাকায় একজন বিশিষ্ট আহমদী ছিলেন এবং নিজ পেশা ও দক্ষতার দিক থেকে বিশেষ খ্যাতি রাখতেন। তিনি একজন মেকানিক ছিলেন এবং তাঁর নিজস্ব ওয়ার্কশপ ছিল। বেশ ভালো ব্যবসা ছিল। সত্যবাদিতা, নীতি-আদর্শের প্রতি আনুগত্য

এবং মিথ্যার প্রতি ঘৃণা ছিল তাঁর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। আগত প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে অত্যন্ত প্রফুল্লতা ও ভালোবাসার সাথে দেখা করতেন। অত্যন্ত উষ্ণতার সাথে সালাম করতেন। তাঁর দোকান থেকে কোনো সাহায্যপ্রার্থী কখনো খালি হাতে ফিরে যেত না।

শহীদ মরহুমের স্ত্রী নাবীদা সাহেবা বর্ণনা করেন যে, খিলাফতের প্রতি তাঁর অগাধ ভালোবাসা ছিল। পাঁচ ওয়াক্ত নামায ছাড়াও তিনি তাহাজ্জুদগুযার ছিলেন এবং নিয়মিত এমটিএ-এর অনুষ্ঠানমালা থেকে উপকৃত হতেন। প্রতি মাসের এক তারিখে নিজের আয়ের হিসাব সম্পন্ন করে সেক্রেটারি মাল সাহেবের সাথে যোগাযোগ করে নিয়মিত চাঁদা পরিশোধ করতেন। তিনি সেক্রেটারি মাল সাহেবের বাড়িতে গিয়ে তা দিয়ে আসতেন। প্রতিদিন নিয়মিত সদকা দিতেন, প্রতি মাসে ছাগলও সদকা করতেন। মসজিদের এবং অন্যান্য আর্থিক তহবিলে সবার আগে নিজের অংশ প্রদান করতেন। তিনি নিজে ওসিয়্যতের ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং পরিবারের সকল সদস্যকেও ওসিয়্যতের অন্তর্ভুক্ত করিয়েছিলেন। কর্মচারীদের প্রতিও তিনি অনেক খেয়াল রাখতেন, তাদের কোনো আর্থিক প্রয়োজন দেখা দিলে বা কেউ অসুস্থ হলে তা তিনি পূরণ করতেন। তাদের সন্তানদের খেয়াল রাখতেন এবং তাদের খরচ মেটানোর চেষ্টা করতেন। তাঁর একটি ওয়ার্কশপ ছিল। মানুষ সাধারণত উপার্জনের দিকে মনোযোগ দেয়, কিন্তু কোনো যাত্রীর গাড়ি যদি নষ্ট হয়ে যেত তবে তিনি খুব কম পারিশ্রমিকে কাজ করে দিতেন এবং অনেক সময় তো কিছু মানুষের কাজ বিনামূল্যেও করে দিতেন। যত ব্যস্ততাই থাকুক না কেন, জামাতী প্রোগ্রামগুলোকে তিনি অগ্রাধিকার দিতেন। মান্ডি বাহাউদ্দিন জেলার আমীর সাহেব বলেন যে, শাহাদাতের সময় শহীদ মরহুম মান্ডি বাহাউদ্দিন শহরে জামাতের সহকারী প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি জায়েদাদ, নায়েব যয়ীম আনসারুল্লাহ ও মুনতাযিম মাল আনসারুল্লাহ হিসেবে সেবা করার তৌফিক পাচ্ছিলেন। তাঁর ওপর অনেক সেবার দায়িত্ব অর্পিত ছিল। মসজিদের দেখাশোনার, অর্থাৎ ব্যবস্থাপনার দায়িত্বও তাঁর ওপর ন্যস্ত ছিল এবং চাবি তাঁর কাছেই থাকত। প্রতি নামাযের সময় গিয়ে তিনি মসজিদ খুলতেন। ব্যবসায়ীরা সাধারণত এদিকে মনোযোগ দেয় না, কিন্তু তিনি প্রতি নামাযের সময় গিয়ে মসজিদ খুলতেন। মোযাফফর মাহমুদ সাহেব, যিনি মুরব্বী সিলসিলা, তিনি বলেন যে, তিনি (অর্থাৎ মরহুম) আমাকে বলেন যে, "আমি বিগত ২৫ বছর ধরে প্রতিদিন ওয়ার্কশপে আসার আগে দুই রাকাত নফল নামায পড়ি।"

শহীদ মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারে তাঁর সম্মানিতা স্ত্রী নাভিদা সাফদার সাহেবা ছাড়াও দুই ছেলে কামরান সাফদার ও লুকমান সাফদার রয়েছেন। তাঁরা বিবাহিত। আল্লাহ তা'লা শহীদ মরহুমের মর্যাদা উন্নীত করুন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে তাঁকে উচ্চ মর্যাদা দান করুন। সকল আত্মীয়স্বজনকে উত্তম ধৈর্যশক্তি দান করুন এবং তাঁদের সাহায্যকারী ও সহায় হোন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ প্রিয় আমাতুল আজীজের, যিনি সম্প্রতি বাষট্টি বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন। বেশ কিছুদিন ধরে তিনি অসুস্থ ছিলেন। إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আল্লাহ তা'লার অনুগ্রহে তিনি ওসিয়তকারী ছিলেন। তিনি হযরত মুস্‌লেহ মওউদ (রা.) এবং হযরত সাইয়্যেদা উম্মে তাহের সাহেবার নাতনি ছিলেন এবং শাহজাদী আমাতুল হাকীম সাহেবা ও মুকাররম সৈয়দ দাউদ মুযাফফর শাহ সাহেবের কন্যা ছিলেন। সৈয়দ দাউদ মুযাফফর সাহেব উম্মে তাহেরের ভাতিজা এবং সৈয়দ মাহমুদুল্লাহ শাহ সাহেবের ছেলে ছিলেন। আমার খালাতো বোনও ছিলেন এবং আমার স্ত্রীর সবচেয়ে ছোট বোনও ছিলেন। তাঁর বিবাহ হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) পড়িয়েছিলেন খালিদ জাফর সাহেবের সঙ্গে। তাঁর প্রথম স্ত্রী ইন্তেকাল করেছিলেন এবং প্রিয় আমাতুল আজীজের সঙ্গে এটি ছিল তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ। আল্লাহ তা'লা তাঁকে দুটি পুত্রসন্তান দান করেছিলেন এবং উভয় পুত্রই যোগ্য। ওকালতি করেন, একজন ওয়াকফে জিন্দেগী হয়েছেন এবং রাবওয়ায় নাজারাত উমূরে আম্মায় কাজ করছেন এবং ভালো ও যোগ্য উকিল। অপরজন হাশির জাফর। প্রথম ছেলের নাম মাহমুদ ইফতেখার এবং দ্বিতীয়জন হাশির আহমদ। তিনিও জার্মানিতে পড়াশোনা করেছেন এবং উচ্চশিক্ষা অর্জন করেছেন। উভয় ছেলে নিজ মায়েরও যথাসাধ্য অনেক সেবা করেছেন। আল্লাহ তা'লা তাঁদেরও উত্তম প্রতিদান দিন এবং ভবিষ্যতেও তাঁদের মায়ের দোয়ার উত্তরাধিকারী করুন এবং পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন।

মরহুমার জীবন যদিও অনেক কষ্টের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু তিনি অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে জীবন কাটিয়েছেন। তাঁর মতো ধৈর্যশীল মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি। মরহুমার ভাই সৈয়দ খালিদ আহমদ শাহ সাহেব বলেন, আমাদের এই বোন তাঁর পিতা-মাতার অনেক সেবা করেছেন এবং মায়ের ইন্তেকালের পর বাবারও অনেক সেবা করেছেন। সহমর্মিতা ও দরিদ্রদের প্রতি যত্নশীলতার ক্ষেত্রে তিনি তাঁর মায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন। খেলাফতের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা ছিল অতুলনীয়। সন্তানদের তরবিয়ত তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে করেছেন। তাঁর একটি বিশেষ গুণ ছিল, তিনি কারও বিরুদ্ধে কোনো কথা বলতেন না এবং কারও (এমন) কথা শুনতেনও না। তিনি নিজের অন্তরকে পরিচ্ছন্ন রাখতেন। কারও কষ্ট তিনি দেখতে পারতেন না। নিজের কষ্ট সহ্য করার সাহস ও ধৈর্য তাঁর অনেক ছিল। যেমনটি আমি বলেছি, তিনি অনেক ধৈর্য ধারণ করেছেন। ঝগড়া-বিবাদ থেকে বাঁচার জন্য তিনি নিজেকে দুনিয়ার ঝামেলা থেকে আলাদা করে নিয়েছিলেন। মানুষ তাঁর সম্পর্কে ভুল কথাও বলেছে এবং মন্দ মন্তব্যও করেছে, কিন্তু তিনি কারও সঙ্গে ঝগড়া করেননি। কিছু মানুষ বিরোধিতা করত, সামান্য হলেও, সব জায়গায় হয়। তো, যাই হোক, তিনি কারও সঙ্গে ঝগড়া করেননি, জবাবও দেননি এবং কাউকে মানসিক কষ্টও দেননি। অন্যদের কষ্ট তাঁর সহ্য হতো না। তাদের সাহায্য করার জন্য তিনি ব্যাকুল থাকতেন। ছোট শিশুদের তিনি খুব ভালোবাসতেন। তিনি অত্যন্ত আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। নিজের প্রয়োজন নিজের অন্তরে লুকিয়ে রাখতেন। কারও কাছে তা প্রকাশ করতেন না। আল্লাহ তা'লার ওপর তাঁর অসাধারণ ভরসা ছিল এবং আল্লাহ তা'লা তাঁর আত্মমর্যাদা রক্ষা করতেন এবং অদৃশ্যভাবে তাঁর প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করে দিতেন।

তাঁর বোন আমাতুর রউফ সাহেবা, যিনি ডাক্তার কাসীর মুজতবা মরহুমের স্ত্রী, তিনি বলেন, আমাদের বোন খুব শান্ত স্বভাবের, নিরীহ ও ধৈর্যশীল ছিলেন। তিনি বলেন, আমার বোন খুব শান্ত স্বভাবের, নিরীহ, ধৈর্যশীল এবং অত্যন্ত আত্মমর্যাদাসম্পন্ন স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। তিনি দরিদ্রদের প্রতি যত্নশীল ছিলেন এবং অনেক বেশি সদকা ও দান-খয়রাত করতেন। খেলাফতের প্রতি অসাধারণ সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করতেন এবং কেউ কোনো কথা বললে তিনি তা সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিতেন। তিনি অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তাঁর ধারণা ছিল, আমি এমন রোগে আক্রান্ত হয়েছি, যেখান থেকে বেঁচে যাওয়া কঠিন; তাই হাসপাতালে যাওয়ার কোনো লাভ নেই। কিন্তু আমি তাঁকে বললাম, আপনি হাসপাতালে যান এবং চিকিৎসা করান। প্রথমে তিনি অস্বীকার করেছিলেন, পরে রাজি হলেন এবং হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসাও করালেন।

তাঁর ছেলে মাহমুদ ইফতেখার বলেন, মা আমাকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলতেন, তোমাদের হযরত মসীহের পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে। এ কারণে তোমাদের ওপর দ্বিগুণ দায়িত্ব রয়েছে যে, তোমরা জামাতের সেবা করবে। তিনি বলেন, খেলাফতে খামেসার শুরুতেই আমরা তখন ছোট শিশু ছিলাম, তাই তিনি আমাদের দুজনকে সঙ্গে সঙ্গে চিঠি লিখিয়েছিলেন যে, খলীফায়ে ওয়াক্তকে চিঠি লেখো। এরপর তিনি আমাদের উপদেশ দিতেন, নিয়মিত চিঠি লিখবে। নামাজ ও খুতবা শোনার জন্য তিনি সবসময় উৎসাহিত করতেন। জামাতের ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে তাঁর অনেক আত্মমর্যাবোধ ছিল এবং তিনি এটা সহ্য করতে পারতেন না যে, ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলা হোক বা সমালোচনা করা হোক। তাঁর ছেলে বলেন, তাঁর সন্তানদের মধ্যে যে-ই ওয়াকফ করত, তাতে তিনি খুব খুশি হতেন এবং বলতেন, তাদের কখনো আর্থিক সংকট হয় না। আর তাঁর দুই ছেলের ব্যাপারেই তাঁর ইচ্ছা ছিল যে, তারা ওয়াকফ করুক। একজন তো ওয়াকফ করে দিয়েছে। তিনি বলেন, আমি যখন ওয়াকফ করলাম, তখন মা আমাকে উপদেশ দিলেন, এখন তুমি ওয়াকফ তো করে দিয়েছ, কিন্তু এটি ভালোভাবে পালন করতে হবে। আর যখন আমার পদোন্নতি হলো এবং আমাকে নায়েব নাজের করা হলো, তখন তিনি বললেন, এখন এ ব্যাপারে কোনো গর্ব করবে না; বরং বিনয় অবলম্বন করবে।

দাপ্তরিক কাজের ব্যাপারে তিনি বলেন, আমার জন্য মা অনেক দোয়া করতেন। জামাতের পরিস্থিতি সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করতেন। শুক্রবারের দিন আমার খোঁজখবর নিতেন এবং কোনো কাজ থাকলে আমাকে জিজ্ঞেস করতেন- কী করছ? আমি যদি বলতাম যে, এ সময় জামাতের কাজ করছি, তখন বলতেন, ঠিক আছে, যদি জামাতি কাজ থাকে তাহলে আগে তোমার জামাতের কাজ শেষ করো, এরপর আমার এই কাজটি করে দিও। তিনি নিজের চেয়ে অন্য মানুষের ব্যাপারে বেশি চিন্তা করতেন এবং তাদের প্রয়োজনের প্রতি যত্নবান ছিলেন। কেউ সাহায্য চাইলে, তাঁর ছেলে লিখেছেন, কেউ সাহায্য চাইলে আম্মা অবশ্যই সাহায্য করতেন। তাঁর মধ্যে সহনশীলতা ও ধৈর্য অনেক ছিল। নিজের কষ্ট সহ্য করে নিতেন, কিন্তু অন্যের কষ্ট সহ্য করতে পারতেন না এবং চাইতেন, কখনো যেন অন্য কারও কষ্ট না হয়; আর অন্যের কষ্ট দূর করার চেষ্টা করতেন। তাঁর সব ভাই-বোন, তাঁদের সন্তান এবং আমার পিতার প্রথম স্ত্রীর সন্তানদের সবার সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত ভালোবাসা ও স্নেহের সম্পর্ক ছিল এবং তিনি সবসময় তাঁদের প্রতি যত্নবান ছিলেন। আমাদের দুই ভাইকেও বলতেন, তোমরা সবসময় একত্রে থাকবে। তোমরা দুজন, তোমাদের মায়েরা আলাদা হলেও, একসঙ্গে থাকবে এবং এক প্রাণ হয়ে থাকবে, আর কখনো ঝগড়া করবে না। তিনি কখনো এমন কোনো কথা বলেননি, যার কারণে আমার পিতার প্রথম স্ত্রীর সন্তানদের সঙ্গে আমাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি হয়; বরং সবসময় ভালোবাসা ও সৌহার্দ্যের সঙ্গে থাকার উপদেশ দিতেন। এখানেও আমি তাঁকে দেখেছি, এ ব্যাপারে তিনি খুবই যত্নশীল ছিলেন। তাঁর স্বামীর প্রথম স্ত্রী যেসব ছোট সন্তান রেখে ইন্তেকাল করেছিলেন, তিনি তাঁদের নিজের সন্তানদের মতোই দেখাশোনা করেছেন। যতটুকু সুযোগ ছিল, যে পরিস্থিতিই ছিল, সে অনুযায়ী তাঁদের জন্য যা কিছু করতে পারতেন, তিনি করেছেন।

তাঁর ছেলে লিখেছেন, আমাদের শৈশবে আমাদের ব্যাপারে মায়ের সবচেয়ে বেশি চিন্তা ছিল, আমাদের কুরআন শরীফ পড়া ও খতম করা। এ জন্য তিনি নিয়মিত আমাদের কুরআন শরীফ পড়ানোর জন্য শিক্ষকের কাছে নিয়ে যেতেন এবং আবার নিয়ে আসতেন। সময়মতো নামায আদায়ের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। তিনি যখন তাঁর পিতা-মাতার কথা উল্লেখ করতেন,

(শেষাংশ ১৬ পাতায়.....)

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর যুক্তরাষ্ট্র সফর (২০২৩)

আমেরিকা জামাতে আহমদিয়ার জাতীয় আমেলার হুযূর আনওয়ার (আই.)-এর বৈঠক (পূর্বের সংখ্যার পর)

হুযূর আনওয়ার-এর জিজ্ঞাসার উত্তরে তরবিয়ত সচিব নিবেদন করেন যে, জরিপ অনুযায়ী ৫৩ শতাংশ সদস্য খুতবা শোনেন। এখন সকল নামাজ কেন্দ্র ও মসজিদে শুক্রবার হুযূর আনওয়ার, আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলার জুমার খুতবার সারাংশ শোনানো হয়। এরপর সম্পূর্ণ খুতবাও তরবিয়ত টিমের কাছে পাঠানো হয়। যত বেশি সম্ভব সদস্য যেন জুমার খুতবা শোনেন, সে চেষ্টা করা হয়।

হুযূর আনওয়ার জিজ্ঞাসা করেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য আপনারা কী পরিকল্পনা করেছেন? এর উত্তরে তরবিয়ত সচিব নিবেদন করেন যে, সর্বপ্রথম আমরা স্থানীয় তরবিয়ত সচিবদের জামাতের সদস্যদের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করাতে চাই।

হুযূর আনওয়ার জিজ্ঞাসা করেন, আপনারা কি আপনাদের সচিবদের কর্মদক্ষতায় সন্তুষ্ট?

এর উত্তরে তরবিয়ত সচিব নিবেদন করেন যে, তিনি সন্তুষ্ট নন। এর পর হুযূর আনওয়ার, আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলা বলেন, আপনাকে নিজেই আপনার সচিবদের সক্রিয় করতে হবে। হ্যাঁ, যদি তাঁরা সহযোগিতা না করেন এবং ধারাবাহিকভাবে অলসতা প্রদর্শন করেন, তাহলে কেন্দ্রকে জানান এবং তাঁদের পরিবর্তন করুন। তাঁদের স্থানে এমন ব্যক্তিদের নিয়ে আসুন যারা পরিশ্রমী।

এরপর তরবিয়ত সচিব নিবেদন করেন যে, এর পাশাপাশি আমাদের পরিকল্পনা হলো বছরে কমপক্ষে ৩০টি জামাত পরিদর্শন করা। এরপর বছরে একটি রিফ্রেশার কোর্সও রাখা হবে।

জেনারেল সেক্রেটারি বিভাগ

এরপর জেনারেল সেক্রেটারি সাহেব হুযূর আনওয়ার, আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলা-এর জিজ্ঞাসার উত্তরে নিবেদন করেন যে, ৫৮টি জামাত রয়েছে যারা তাদের রিপোর্ট পাঠায়। হুযূর আনওয়ার জিজ্ঞাসা করেন, আপনারা কি নিয়মিতভাবে এসব রিপোর্টের ওপর মন্তব্য করেন অথবা নিজেদের মতামত পাঠান? এর উত্তরে জেনারেল সেক্রেটারি সাহেব নিবেদন করেন যে, এ বিষয়ে দুর্বলতা রয়েছে।

হুযূর আনওয়ার বলেন, আপনারা যদি জামাতগুলোর কার্যক্রমের ওপর প্রতিক্রিয়া বা মন্তব্য না করেন, তাহলে জামাতগুলোও অলসতা প্রদর্শন করবে।

হুযূর আনওয়ার-এর জিজ্ঞাসার উত্তরে জেনারেল সেক্রেটারি সাহেব নিবেদন করেন যে, তিনি মাসিক রিপোর্ট কেন্দ্রে পাঠান না। এর পর হুযূর আনওয়ার বলেন, আপনি জেনারেল সেক্রেটারি। আপনার নিজের মাসিক রিপোর্টও নিয়মিতভাবে কেন্দ্রে পাঠানো উচিত।

কৃষি বিভাগ

পরবর্তীতে কৃষি সচিব নিজের পরিচয় প্রদান করেন। হুযূর আনওয়ার বলেন, আপনাদের জামাতের জমিতে কৃষিকাজ শুরু করা উচিত।

শিক্ষা বিভাগ

এরপর জাতীয় শিক্ষা সচিব হুযূর আনওয়ার-এর জিজ্ঞাসার উত্তরে নিবেদন করেন যে, বর্তমানে তাঁদের কাছে ছাত্রদের কোনো নির্দিষ্ট তথ্য নেই। তাঁরা এই তথ্য সংগ্রহ করা শুরু করবেন।

হুযূর আনওয়ার বলেন, আমার মনে হয় আপনি একা এই কাজ করতে পারবেন না। আপনাকে ছাত্রদের নিয়ে একটি দল গঠন করতে হবে অথবা যারা শিক্ষা ক্ষেত্রে রয়েছেন, তাঁদের দলে রাখতে হবে।

হুযূর আনওয়ার জিজ্ঞাসা করেন, ছাত্রদের কাউন্সেলিং বা তাদের দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য আপনারা কি কোনো কমিটি গঠন করেছেন?

শিক্ষা সচিব নিবেদন করেন যে, হাই স্কুলের ছাত্রদের জন্য প্রতিবছর একটি যুব ক্যাম্প আয়োজন করা হয়। এ সময় ছাত্রদের সঙ্গে বিভিন্ন সেশন অনুষ্ঠিত হয়। এটি জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রায় একশত ছাত্র অংশগ্রহণ করে।

হুযূর আনওয়ার বলেন, মানুষ খুঁজে একটি দল তৈরি করুন যারা আপনাকে সাহায্য করবে।

রিশতা নাতা বিভাগ

এরপর রিশতা নাতা সচিব হুযূর আনওয়ার-এর জিজ্ঞাসার উত্তরে নিবেদন করেন যে, বছরে ১৭টি বিবাহের সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে।

হুযূর আনওয়ার-এর জিজ্ঞাসার উত্তরে সচিব সাহেব নিবেদন করেন যে, যাদের বিবাহের সম্পর্ক স্থাপন করা হয়, তাঁদের বিবাহের আগে কাউন্সেলিং করা হয় এবং এরপর বিবাহের ছয় মাস পরও একটি জরিপ ফরম পাঠানো হয়, যার মাধ্যমে তাঁদের মতামত নেওয়া হয়।

হুযূর আনওয়ার জিজ্ঞাসা করেন, লাজনা ও খুদ্দামের কোনো যৌথ কাউন্সেলিং সেশনও কি করা হয়? এর উত্তরে রিশতা নাতা সচিব নিবেদন করেন যে, আমরা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে খুদ্দাম ও লাজনার সঙ্গে সেশন আয়োজন করি।

হুযূর আনওয়ার বলেন, আপনারা যে প্রচলিত নির্দেশিকাগুলো অনুসরণ করছেন, শুধু সেগুলো অনুসরণ করাই জরুরি নয়। আপনারা নিজেদের পরিস্থিতি অনুযায়ী বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসন্ধান করতে পারেন।

হুযূর আনওয়ার-এর জিজ্ঞাসার উত্তরে রিশতা নাতা সচিব নিবেদন করেন যে, তাঁদের ডেটাবেসে মোট ৫৭৩ জন ছেলে ও মেয়ের তথ্য রয়েছে। এর মধ্যে ২২৭ জন ছেলে এবং ৩৪৬ জন মেয়ে।

হুযূর আনওয়ার-এর জিজ্ঞাসার উত্তরে রিশতা নাতা সচিব নিবেদন করেন যে, ছেলেদের মধ্যে ৭০ শতাংশের বয়স ৪০ বছরের কম। তাঁদের ডেটাবেসে ২০ শতাংশ এমন ব্যক্তি রয়েছেন যাদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছে।

বৈদেশিক বিষয়াদি বিভাগ

এরপর বৈদেশিক বিষয়াদি সচিব হুযূর আনওয়ার-এর জিজ্ঞাসার উত্তরে নিবেদন করেন যে, গত বছর বিভিন্ন রাজনীতিবিদদের সঙ্গে ৫৯৬টি সাক্ষাৎ হয়েছে।

হুযূর আনওয়ার জিজ্ঞাসা করেন, আপনারা কি এমন এলাকায়ও যান যেখানে আমাদের জামাত প্রতিষ্ঠিত নেই? এর উত্তরে বৈদেশিক বিষয়াদি সচিব নিবেদন করেন যে, বছরে এমন বিভিন্ন এলাকার রাজনীতিবিদদের সঙ্গে ওয়াশিংটন ডিসিতে সাক্ষাৎ হয়েছে।

হুযূর আনওয়ার বলেন, আপনারা ওয়াকিফিনে নও-এর মধ্য থেকেও তরুণদের নিজেদের দলে অন্তর্ভুক্ত করুন এবং তাঁদের প্রশিক্ষণ দিন, যারা আইন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান অথবা জনসংযোগ বিষয়ে পাশাপাশি পড়াশোনা করবে।

নওমুবাইয়িনদের তরবিয়ত বিভাগ

পরবর্তীতে নওমুবাইয়িনদের তরবিয়ত সচিব হুযূর আনওয়ার-এর জিজ্ঞাসার উত্তরে নিবেদন করেন যে, তিনি জন্মগতভাবে আহমদি।

হুযূর আনওয়ার বলেন, আপনাদের স্থানীয় সচিবদের মধ্যে কতজন সক্রিয়? এর উত্তরে নওমুবাইয়িনদের তরবিয়ত সচিব নিবেদন করেন যে, খুব কম সংখ্যক সচিব সক্রিয়। বর্তমানে মাত্র সাতজন সচিব সাড়া দিচ্ছেন।

হুযূর আনওয়ার-এর জিজ্ঞাসায় তিনি নিবেদন করেন যে, গত তিন বছরের মোট ২২৯ জন নওমুবাইয়িন রয়েছেন এবং তাঁর শাখার পক্ষ থেকে তাঁদের সঙ্গে এখনও যোগাযোগ হয়নি, কারণ তিনি এ বছর এই শাখার জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। গত মেয়াদে রহিম লতিফ সাহেব নওমুবাইয়িনদের তরবিয়ত সচিব ছিলেন।

এর পর হুযূর আনওয়ার বলেন, যিনি আগে নওমুবাইয়িনদের তরবিয়ত সচিব ছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই কোনো ফাইল ইত্যাদি প্রস্তুত করে থাকবেন। আপনারা সেই ফাইলগুলো পড়ুন। একইভাবে স্থানীয় নওমুবাইয়িনদের তরবিয়ত সচিবদের সঙ্গে বৈঠক করুন, তাঁদের দিকনির্দেশনা দিন এবং তাঁদের নিয়মিত লক্ষ্য নির্ধারণ করে দিন, যেন তাঁরা প্রত্যেক নওমুবাইয়ের কাছে পৌঁছাতে পারেন। অন্যথায় আপনি যদি তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ না রাখেন, তাহলে তাঁরা পিছিয়ে পড়বেন।

ওয়াকফে জাদীদ বিভাগ

এরপর ওয়াকফে জাদীদ সচিব নিজের পরিচয় প্রদান করেন। হুযূর আনওয়ার বলেন, এর বিষয়টিও তাহরীকে জাদীদের মতোই। প্রায় ১.২ মিলিয়ন অর্থ মজলিস আনসারুল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়েছে, অথচ মোট সংগৃহীত অর্থ ছিল ২.২ মিলিয়ন। অবশিষ্ট এক মিলিয়ন লাজনা ও খুদ্দামের পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়েছে।

হুযূর আনওয়ার বলেন, আপনাদের কাছে এমনিতেই অনেক পরিকল্পনা থাকে। নিজেদের শাখার জন্যও কোনো পরিকল্পনা করুন। নিজেদের শাখার প্রতি মনোযোগ দিন। নিশ্চিত করুন যে প্রত্যেক আহমদি এই আন্দোলনের অংশ হয়। সদর লাজনা ও সদর খুদ্দামুল আহমদিয়ার সঙ্গে বৈঠক করুন।

তবলীগ বিভাগ

পরবর্তীতে তবলীগ সচিব নিবেদন করেন যে, এ বছর তাঁদের এক হাজার বয়াতের লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের পরিকল্পনা ছিল এক হাজার মানুষকে জলসায় নিয়ে আসা।

হুযূর আনওয়ার বলেন, আপনাদের স্থানীয় জামাতগুলোর তবলীগ সচিবরা যদি সক্রিয় হন, তাহলে আপনারা এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পারেন। এ ছাড়াও মুবাল্লিগদের কাছ থেকে সাহায্য নিন। প্রত্যেক জামাতের তবলীগ সচিবের উচিত নিজের জামাতে দায়িয়ানে ইলাল্লাহর একটি দল তৈরি করা।

তবলীগ সচিব নিবেদন করেন যে, তাঁরা দায়িয়ানদের নিয়ে কাজ করছেন এবং প্রায় প্রত্যেক জামাতেই দায়িয়ান রয়েছেন।

সীরাত খাতামান নাবীঈন

-মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম.এ.(রা.)

প্রচারকার্যের সূচনা

এখন তাঁর প্রকৃতিতে একাগ্রতা ও প্রশান্তি ছিল। ফলে তিনি মানুষকে পরম এক আল্লাহর একত্বের দিকে আহ্বান করতে শুরু করলেন এবং শিরকের বিরুদ্ধে শিক্ষা দিতে লাগলেন। কিন্তু প্রথমদিকে তিনি তাঁর কর্মসূচির প্রকাশ্য ঘোষণা দেননি। বরং অত্যন্ত নীরবে কার্যক্রম শুরু করলেন এবং তাঁর শিক্ষাকে কেবল তাঁর পরিচিতজনদের পরিসরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলেন।

ইসলামের বার্তা

যদিও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে শিক্ষা নিয়ে এসেছিলেন, তার কাঠামো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার যথাযথ সুযোগ সামনে আসবে, তবু এখানে ইসলামের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে হয়, যাতে আমাদের পাঠকরা জানতে পারেন যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্মসূচি কী ছিল এবং তার মূলনীতি কী ছিল।

সুতরাং জানা উচিত যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীর সামনে যে ধর্ম উপস্থাপন করেছিলেন, তার নাম ইসলাম। ইসলামের অর্থ হলো নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে দেওয়া। আর এটিই তাঁর আনীত শিক্ষার প্রকৃত সারসংক্ষেপ।

তাঁর ধর্মের প্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মূলনীতি হলো আল্লাহর একত্ব। অর্থাৎ, এই জগতের সৃষ্টিকর্তা ও মালিক এক আল্লাহ, যিনি তাঁর সত্তা ও গুণাবলিতে একক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। তিনি চিরকাল আছেন এবং চিরকাল থাকবেন। পৃথিবী ও আকাশের সবকিছু তাঁরই সৃষ্ট এবং তাঁরই সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত। অতএব, তাঁর ছাড়া অন্য কারও উপাসনা করা বৈধ নয়। আর মানুষ আল্লাহ ছাড়া যেসব উপাস্য তৈরি করে নিয়েছে, সেগুলো সবই কাল্পনিক ও মিথ্যা।

এটিই ছিল প্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মূলনীতি, যা তিনি মক্কার অধিবাসীদের সামনে উপস্থাপন করেছিলেন।

দ্বিতীয় মূলনীতি হিসেবে তিনি বলেছিলেন যে, আল্লাহ তাআলা একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অনুসারে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। সেই উদ্দেশ্য হলো, মানুষ যেন তাঁকে চিনতে পারে, তাঁর গুণে নিজেদের রাঙিয়ে তুলতে পারে এবং নিজেদের জন্য চিরন্তন উন্নতির উপকরণ সৃষ্টি করতে পারে। এই উদ্দেশ্যে তিনি মানবজীবনকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। একটি হলো পার্থিব জীবন, যা কর্মের ক্ষেত্র; আর অন্যটি হলো পরকালের জীবন, যা কর্মের প্রতিদানের ক্ষেত্র। এই উভয় জীবনের মাঝখানে মৃত্যুকে সীমারেখা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

তৃতীয় মূলনীতি হিসেবে তিনি উপস্থাপন করেছিলেন যে, আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর হেদায়েতের জন্য নিজের পক্ষ থেকে রসূল ও নবীদের প্রেরণ করতে থাকেন। তাঁরা আল্লাহর কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করে পৃথিবীর হেদায়েতের ব্যবস্থা করেন। এমন রসূল ও নবী প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক দেশ এবং প্রত্যেক যুগে এসেছেন। তাঁদেরই মধ্যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আল্লাহর একজন রসূল।

এগুলোই ছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাথমিক কর্মসূচির ভিত্তি স্থাপনকারী তিনটি মূলনীতি। কিন্তু সময় যত অতিক্রান্ত হতে লাগল, ততই আরও কিছু মূলনীতি এবং সেই মূলনীতিগুলোর আরও শাখা-প্রশাখা ও বিস্তারিত বিধান অবতীর্ণ হতে থাকল। অবশেষে তাঁর নিয়ে আসা শিক্ষা বর্তমান পবিত্র কুরআনের রূপে পূর্ণতা লাভ করল এবং তিনি সকল পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মানুষের নেতা, নবীদের শিরোমণি এবং সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ শরিয়ত নিয়ে আগমনকারী হিসেবে নির্ধারিত হলেন।

সর্বপ্রথম মুসলমান

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাঁর প্রচারের কাজ শুরু করেন, তখন সর্বপ্রথম ঈমান গ্রহণ করেছিলেন হযরত খাদিজা (রা.)। তিনি এক মুহূর্তের জন্যও দ্বিধা করেননি। হযরত খাদিজা (রা.)-এর পর পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম কে ঈমান গ্রহণ করেছিলেন, সে বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ হযরত আবু বকর আবদুল্লাহ ইবনে আবি কুহাফা (রা.)-এর নাম উল্লেখ করেন। কেউ বলেন, হযরত আলী (রা.), যাঁর বয়স তখন মাত্র দশ বছর ছিল। আবার কেউ বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুক্ত করা দাস হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা (রা.) সর্বপ্রথম ঈমান গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু আমাদের মতে, এ নিয়ে বিতর্ক করা অর্থহীন। হযরত আলী (রা.) ও হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা (রা.) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারেরই সদস্য ছিলেন এবং তাঁর সন্তানদের মতো তাঁর সঙ্গে বসবাস করতেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা ছিল তাঁদের জন্য যথেষ্ট, আর তাঁরা ঈমান গ্রহণ করতেন। বরং তাঁদের ক্ষেত্রে হয়তো মৌখিক স্বীকারোক্তিরও প্রয়োজন ছিল না। অতএব, তাঁদের নাম এ বিতর্কের মধ্যে আনার প্রয়োজন নেই। আর অবশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে হযরত আবু বকর (রা.) যে সর্বাগ্রে ও সর্বপ্রথম ঈমান গ্রহণকারী ছিলেন, তা সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত। এ প্রসঙ্গে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারের কবি হযরত হাসসান ইবনে সাবিত আনসারি (রা.) হযরত আবু বকর (রা.) সম্পর্কে বলেন-

اِذَا تَذَكَّرْتَ شَجْوًا مِنْ اَخِيْ ثِقَةٍ	فَاذْكُرْ اَخَاكَ اَبَا بَكْرٍ بِمَا فَعَلَا
خَيْرَ الْبَرِ يَّةِ اَتْقَا هَاوَاَ عَدَّلَهَا	بَعْدَا النَّبِيِّ وَاَوْفَاهَا بِمَا حَمَلَا
اَلثَّانِيَ اَلتَّالِيَ الْمَحْمُوْدَ مَشْهَدَهُ	وَاَوَّلَ النَّاسِ مِنْهُمْ صَدَّقَ الرُّسُلَا

অর্থাৎ, "যখন কখনো তোমার অন্তরে কোনো বিশ্বস্ত ও উত্তম ভাইয়ের স্মৃতি থেকে বেদনাময় অনুভূতির উদয় হয়, তখন তোমার ভাই আবু বকরের কথাও স্মরণ কোরো- তাঁর সেইসব গুণের কারণে, যেগুলো স্মরণযোগ্য। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর তিনি সকল মানুষের মধ্যে সর্বাধিক পরহেজগার ও সর্বাধিক ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তিনি নিজের ওপর অর্পিত দায়িত্বগুলো সর্বাধিক নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন। হ্যাঁ, তিনিই সেই আবু বকর, যিনি সাওর গুহায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন; যিনি তাঁর অনুসরণে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলীন করে দিয়েছিলেন। তিনি যে কাজেই হাত দিতেন, সেটিকে সুন্দর করে তুলতেন। আর তিনিই ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি, যিনি রাসুলের প্রতি ঈমান এনেছিলেন।"

হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর আভিজাত্য ও যোগ্যতার কারণে কুরাইশদের মধ্যে অত্যন্ত সম্মানিত ও মর্যাদাবান ছিলেন। আর ইসলামে তিনি এমন এক মর্যাদা লাভ করেছিলেন, যা অন্য কোনো সাহাবি লাভ করেননি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাবির প্রতি হযরত আবু বকর (রা.) এক মুহূর্তের জন্যও সন্দেহ পোষণ করেননি; বরং তা শোনামাত্রই গ্রহণ করেছিলেন। এরপর তিনি নিজের সমস্ত মনোযোগ, জীবন ও সম্পদ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনীত ধর্মের সেবায় উৎসর্গ করে দেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবিদের মধ্যে আবু বকর (রা.)-কে অধিক ভালোবাসতেন। তাঁর ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর প্রথম খলিফা হন। খিলাফতের সময়েও তিনি অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

হযরত আবু বকর (রা.) সম্পর্কে ইউরোপের বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ সেপ্রঞ্জার লিখেছেন-

"ইসলামের প্রাথমিক যুগে আবু বকরের মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন এ কথার সবচেয়ে বড় প্রমাণ যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হয়তো প্রতারিত হতে পারতেন, কিন্তু তিনি কখনো প্রতারক ছিলেন না। বরং তিনি আন্তরিকভাবে নিজেকে আল্লাহর রসুল বলে বিশ্বাস করতেন।"

স্যার উইলিয়াম মিউরও সেপ্রঞ্জারের এই মতের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারীগণ

হযরত খাদিজা (রা.), হযরত আবু বকর (রা.), হযরত আলী (রা.) ও হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা (রা.)-এর পর আরও পাঁচজন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন, যাঁরা হযরত আবু বকর (রা.)-এর প্রচারের মাধ্যমে ঈমান এনেছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই ইসলামের ইতিহাসে এমন মহান ও উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন সাহাবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন যে, তাঁদের গণ্য করা হয় শ্রেষ্ঠ সাহাবিদের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে। তাঁদের নাম নিম্নরূপ-

প্রথমত, হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা.), যিনি বনু উমাইয়া বংশের ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের সময় তাঁর বয়স ছিল প্রায় ত্রিশ বছর। হযরত উমর (রা.)-এর পর তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তৃতীয় খলিফা হন। হযরত উসমান (রা.) ছিলেন অত্যন্ত লজ্জাশীল, বিশ্বস্ত, কোমল হৃদয়ের, উদার ও ধনসম্পদের অধিকারী ব্যক্তি। ইসলামের জন্য তিনি বিভিন্ন সময়ে বিপুল আর্থিক অবদান রেখেছিলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে হযরত উসমান (রা.)-কে কতটা ভালোবাসতেন, তা এ ঘটনা থেকেই বোঝা যায় যে, তিনি পরপর নিজের দুই কন্যাকে তাঁর সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন। এ কারণেই তাঁকে 'যুন-নুরাইন' বা দুই জ্যোতির অধিকারী বলা হয়।

দ্বিতীয়ত, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.)। তিনি বনু যুহরা বংশের ছিলেন। এই বংশেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাতার জন্ম হয়েছিল। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ ও সুবিবেচক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফত নির্ধারণের বিষয়টি তাঁর হাতেই নিষ্পত্তি হয়েছিল। ইসলাম গ্রহণের সময় তাঁর বয়স ছিল প্রায় ত্রিশ বছর। তিনি উসমানি খিলাফতের সময় ইন্তেকাল করেন।

তৃতীয়ত, হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.)। ইসলামগ্রহণের সময় তিনি ছিলেন একেবারেই তরুণ; তাঁর বয়স ছিল মাত্র উনিশ বছর। তিনিও বনু যুহরা বংশের ছিলেন এবং অত্যন্ত সাহসী ও বীর যোদ্ধা ছিলেন। হযরত উমর (রা.)-এর শাসনামলে তাঁর নেতৃত্বেই ইরাক বিজিত হয়। আমির মুয়াবিয়ার শাসনামলে তিনি ইন্তেকাল করেন।

চতুর্থত, হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রা.)। তিনি ছিলেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফুফাতো ভাই; অর্থাৎ তিনি ছিলেন হযরত সাফিয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র। পরবর্তীকালে তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-এর জামাতাও হন। তিনি বনু আসাদ বংশের ছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র পনেরো বছর। খন্দকের যুদ্ধের সময় একটি বিশেষ দায়িত্ব পালন করার কারণে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে 'হাওয়ারি' উপাধি প্রদান করেছিলেন। হযরত আলী (রা.)-এর শাসনামলে উটের যুদ্ধে অংশগ্রহণের পর হযরত যুবাইর (রা.) শহিদ হন।

সীরাতুল মাহদী

-হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ.

১০২) পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

বিনীত নিবেদক নিবেদন করছেন যে, হযরত খলিফাতুল মসীহ আল-আউয়াল (রা.) বর্ণনা করতেন, আমি যখন প্রথমবার কাদিয়ানে এসেছিলাম, তখন ছোট মসজিদের কাছে যে চত্বরটি রয়েছে, সেখানে এক্কা থেকে নেমেছিলাম। এরপর আমি এক্কাওয়ালাকে, অথবা সম্ভবত অন্য কাউকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "মির্জা সাহেব কোথায় আছেন? "সে সময় মির্জা ইমামুদ্দিন ও মির্জা নিজামুদ্দিন তাঁদের উঠানে খাটিয়ার ওপর বসে আসর জমিয়ে ছিলেন। লোকটি তাঁদের দিকে ইশারা করে বলল, "ওই যে তাঁরা।"

আমি সেদিকে তাকাতেই আমার বুক ধক করে উঠল। তখন আমি এক্কাওয়ালাকে বললাম, "এখনই যেয়ো না, একটু অপেক্ষা করো। হয়তো আমাকে এখনই ফিরে যেতে হতে পারে।"

এরপর আমি এগিয়ে সেই আসরে গেলাম। কিন্তু আমার মনে এমন একটি প্রভাব পড়েছিল যে, সেখানে গিয়ে কাউকে সালাম না করেই খাটিয়ার ওপর বসে পড়লাম। মির্জা ইমামুদ্দিন, অথবা সম্ভবত তিনি বলেছিলেন মির্জা নিজামুদ্দিন, আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন। আমি নাম বললে তাঁরা বললেন, "আপনি সম্ভবত মির্জা সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন।"

মাওলানা সাহেব বলতেন, তখন আমার প্রাণে প্রাণ ফিরে এল। আমি বুঝতে পারলাম, এখানে অন্য একজন মির্জা সাহেবও রয়েছেন। এরপর তাঁরা আমার সঙ্গে একজন লোককে দিয়ে দিলেন, যিনি আমাকে ছোট মসজিদে পৌঁছে দিলেন। সে সময় হযরত সাহেব ঘরের ভেতরে অবস্থান করছিলেন। তাঁকে খবর দেওয়া হলে তিনি বললেন, "আমি জোহরের নামাজের সময় বাইরে আসব।" এরপর হযরত যখন বাইরে এলেন, তখন আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম।

বিনীত নিবেদক নিবেদন করছেন যে, মাওলানা সাহেব বারাহিনে আহমদিয়া রচনার সময়কালে এখানে এসেছিলেন। মওলানা শের আলী সাহেব বর্ণনা করতেন যে, হযরত সাহেব কোথাও লিখেছেন, আমি প্রার্থনা করতাম, আল্লাহ যেন আমাকে মূসার মতো হারুন দান করেন। এরপর যখন মওলানা সাহেব এলেন, তখন তাঁকে দেখামাত্রই আমি চিনতে পেরেছিলাম যে, هٰذَا دُعَائِیْ -"ইনিই আমার প্রার্থনার ফল।"

(বিনীত নিবেদক নিবেদন করছেন যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম গ্রন্থে তাঁর এই প্রার্থনার উল্লেখ করেছেন। তবে সেখানে হযরত মূসা ও হারুনের দৃষ্টান্ত দেননি। আশ্চর্যের বিষয় হলো, কারামাতুস সাদিকীন গ্রন্থে সংকলিত হযরত মাওলানা সাহেবের নিজের লিখিত বিবরণ অনুযায়ী, তাঁরও নিজের জন্য এমন একজন পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্বের সন্ধান ছিল, যিনি এই অশান্তিপূর্ণ সময়ের ফিতনাগুলোর মোকাবিলা করতে পারবেন এবং ইসলামকে অন্যান্য ধর্মের ওপর বিজয়ী করে দেখাতে পারবেন।)

১০৩) পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

হযরত খলিফাতুল মসীহ আল-আউয়াল (রা.) বর্ণনা করতেন, যখন আমি জম্মুর চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করে ভেরায় ফিরে এলাম, তখন সেখানে একটি বড় বাড়ি নির্মাণের কাজ শুরু করলাম। বাড়ি নির্মাণের জন্য কিছু নির্মাণসামগ্রী কেনার উদ্দেশ্যে আমি লাহোরে এসেছিলাম। লাহোরে এসে আমার মনে হলো, একবার কাদিয়ানেও ঘুরে যাই এবং সেখানে এক দিন কাটিয়ে আসি। যাই হোক, আমি এখানে এলাম এবং হযরত সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম।

হযরত আমাকে বললেন, "মাওলানা সাহেব, এখন তো আপনি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। আশা করি, এখানে কয়েক দিন অবস্থান করবেন।"

আমি নিবেদন করলাম, "জি, হুজুর, অবস্থান করব।"

এরপর কয়েক দিন অতিবাহিত হলে তিনি বললেন, "মাওলানা সাহেব, এখানে একা থাকতে আপনার হয়তো কষ্ট হয়। আপনার পরিবারের সদস্যদেরও এখানে ডেকে নিন।"

আমি ভেড়ায় পরিবারের সদস্যদের কাছে চিঠি লিখে জানিয়ে দিলাম, বাড়ি নির্মাণের কাজ বন্ধ করে দিয়ে এখানে চলে আসতে।

এরপর একবার হযরত সাহেব আমাকে বললেন, "মওলানা সাহেব, এখন আপনি আপনার অতীত আবাসভূমি ভেরার কথা মনেও আনবেন না।"

মাওলানা সাহেব বলতেন, আমি মনে মনে খুব ভয় পেয়ে গেলাম। ভাবলাম, এমনও কি হতে পারে যে, আমি আর কখনো সেখানে যাব না? কিন্তু এমনটি কীভাবে সম্ভব যে, আমার মনেও ভেড়ার কথা আসবে না? কিন্তু মাওলানা সাহেব বলতেন, আল্লাহর এমন অনুগ্রহ হয়েছিল যে, আজ পর্যন্ত আমার মনে কখনো এই চিন্তাও আসেনি যে, ভেড়াও একসময় আমার আবাসভূমি ছিল।

(বিনীত নিবেদক নিবেদন করছেন যে, মওলানা সাহেব সম্ভবত ১৮৯১ অথবা ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে জম্মুর চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন এবং ১৮৯২ অথবা ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে কাদিয়ানে চলে এসেছিলেন।)

১০৪) পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

মাওলানা শের আলী সাহেব আমাকে বর্ণনা করেছিলেন যে, হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস সালাম বলতেন, "আমাদের আরবি রচনাগুলো সবই একই প্রকৃতির ইলহামস্বরূপ; কারণ, এগুলো সবই আল্লাহর বিশেষ সমর্থনে লেখা হয়েছে।"

তিনি বলতেন, "কখনো কখনো আমি কয়েকটি শব্দ ও বাক্যাংশ লিখে ফেলি, অথচ সেগুলোর অর্থ আমার জানা থাকে না। এরপর লেখা শেষ করে যখন অভিধান দেখি, তখন অর্থ জানতে পারি।"

এ ছাড়া, উল্লিখিত মওলানা সাহেব বর্ণনা করেন যে, হযরত সাহেব তাঁর আরবি গ্রন্থগুলোর অনুলিপি ও মুদ্রণের পূর্ববর্তী প্রুফ হযরত খলিফাতুল মসীহ আল-আউয়াল (রা.) এবং মাওলানা মুহাম্মদ আহসান সাহেবের কাছেও পাঠাতেন। তিনি বলতেন, "যদি কোথাও সংশোধন করা সম্ভব হয়, তাহলে করে দেবেন।"

হযরত খলিফাতুল মসীহ আল-আউয়াল (রা.) সেগুলো পড়ে একই অবস্থায় ফিরিয়ে দিতেন। কিন্তু মাওলানা মুহাম্মদ আহসান সাহেব অত্যন্ত পরিশ্রম করে কোনো কোনো স্থানে সংশোধনের উদ্দেশ্যে শব্দ পরিবর্তন করে দিতেন।

মাওলানা শের আলী সাহেব বর্ণনা করেন, একবার হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছিলেন, "মাওলানা মুহাম্মদ আহসান সাহেব নিজের পক্ষ থেকে সংশোধন করেন ঠিকই, কিন্তু আমি লক্ষ্য করি, আমার লেখা শব্দটি অধিক যথাযথ স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে এবং অধিকতর প্রাঞ্জল; আর মওলানা সাহেবের দেওয়া শব্দটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল। তবে কোনো কোনো স্থানে আমি তাঁর দেওয়া শব্দটিও রেখে দিই, যাতে তাঁর মনঃকষ্ট না হয়-এই ভেবে যে, তাঁর লেখা সব শব্দই কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে।"

বিনীত নিবেদক নিবেদন করছেন যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর রীতি ছিল, তিনি তাঁর আরবি গ্রন্থগুলোর অনুলিপি ও মুদ্রণের পূর্ববর্তী প্রুফ জামাতের আলেমদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন এবং বলতেন, "দেখুন, কোথাও কোনো সংশোধন করা সম্ভব কি না।"

এই ব্যবস্থার পেছনে তাঁর একটি উদ্দেশ্য এ-ও ছিল যে, এর মাধ্যমে তাঁরা যেন তাঁর রচনাগুলো পড়ার সুযোগ পান এবং হযরতের শিক্ষা ও জামাত সম্পর্কে অবগত থাকেন। এটি এই বিনীত নিবেদকের নিজস্ব ধারণা; কোনো বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে বলা নয়।

১০৫) পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

হাফেজ রওশন আলী সাহেব আমাকে বর্ণনা করেছিলেন যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যখন এজাযে আহমদি গ্রন্থে 'আয়া আরজা মুদ্দিন কৃদ দাফাকি' শীর্ষক কাসিদাটি রচনা করছিলেন, তখন সেটি পুনরায় পড়ার পর তিনি বাইরে এসে হযরত খলিফাতুল মসীহ আল-আউয়াল (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, "মাওলানা সাহেব, 'আয়া' শব্দটিও কি সম্বোধনসূচক অব্যয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়?

উত্তরে নিবেদন করা হলো, "জি হুজুর, এটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ।"

তিনি বললেন, "কবিতায় শব্দটি লেখা হয়েছে, অথচ এ বিষয়ে আমাদের কোনো ধারণাই ছিল না।"

এ ছাড়া, হাফেজ সাহেব বর্ণনা করেন যে, হযরত প্রায়ই বলতেন, "কিছু শব্দ আপনা-আপনিই আমাদের কলম থেকে লিখিত হয়ে যায়, অথচ সেগুলোর অর্থ আমাদের জানা থাকে না।"

হাফেজ সাহেব বলেন, অনেক সময় হযরত সাহেবের লেখায় এমন বাগ্‌ধারাও লিখিত হতো, যার ব্যবহার সাধারণ অভিধানেও পাওয়া যেত না। কিন্তু এরপর ব্যাপক অনুসন্ধানের মাধ্যমে সেগুলোর ব্যবহার সম্পর্কে জানা সম্ভব হতো।

বদরের কপি সংরক্ষণ করুন

এই সংবাদপত্র ধর্মীয় ও দুনিয়াবী জ্ঞানের এক অমূল্য ভাণ্ডার, যা দুনিয়াবী অপবিত্রতা থেকে মুক্ত। এটি জাতীয় আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন পূরণ করে। বদরে কুরআনের আয়াত, হাদীসে নববী, মির্জা গোলাম আহমদের মালফুজাত ও লেখনীসমূহ এবং অসংখ্য পবিত্র উল্লেখ রয়েছে। এগুলো অধ্যয়ন করা, অন্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়া, সেগুলো অনুসরণ করা এবং শিশুদের শিক্ষা ও নৈতিক প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহার করা আমাদের সকলের কর্তব্য। এই সকল উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য আল ফজলের কপি সংরক্ষণ করা এবং সেগুলোকে সঠিকভাবে রেকর্ডে সংগঠিত করে রাখা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

এই উপাদান, যা ধর্মীয় শিক্ষা ও নৈতিক প্রশিক্ষণকেন্দ্রিক, সম্প্রদায়ের সদস্যদের কাছ থেকে সম্মান দাবি করে। এটাকে অন্যান্য সংবাদপত্রের সাথে স্ক্র্যাপ হিসেবে বিক্রি করা তার পবিত্রতা ও সম্মান লঙ্ঘনের সমতুল্য। যদি সংরক্ষণ করা সম্ভব না হয়, তবে সতর্কতার সাথে নিষ্পত্তি করুন যাতে এই পবিত্র লেখাগুলো অসম্মানিত না হয় এবং অভিযোগ বা অসম্মানের কারণ না হয়ে দাঁড়ায়।

আশা করা যায় যে সম্প্রদায়ের সদস্যরা এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেবেন, এই প্রকাশনাগুলো থেকে পূর্ণভাবে উপকৃত হবেন এবং এই বিষয়গুলো মনে রাখবেন। (সম্পাদকীয়)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
akhbaarbadarbanglaqdn@gmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2026 -2028 Vol-11 Thursday, 22-29 Oct, 2026 Issue No.43-44

Act.
MANAGER
ATHAR AHMAD SHAMIM
Mob: +91 9815639670
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

১২ পাতার পর.....

তখন তাঁদের সেবার কথা অনেক বেশি বলতেন। এ কথাও বলতেন, হায়! তাঁরা যদি জীবিত থাকতেন, তাহলে দেখতেন যে, তাঁরা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে জীবন কাটিয়েছেন, কিন্তু বর্তমানে আমাদের পরিস্থিতি তাঁদের তুলনায় অনেক ভালো এবং স্বচ্ছলতা রয়েছে। তাঁর পিতা-মাতার সেবাকারীদেরও তিনি অনেক সেবা করতেন এবং তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। এরপর এই ছেলে বলেন, মা আমাদের যা বলতেন, নিজে তার ওপর অনেক বেশি আমল করতেন। তিনি আমাদের নেককার বুযুর্গদের উপদেশপূর্ণ ঘটনাবলিও শোনাতেন। শৈশবে পড়ার জন্য তিনি আমাদের যে প্রথম বইটি দিয়েছিলেন, আমরা যখন পড়তে শিখলাম, সেটি হযরত সাইয়্যেদনা বিলাল এবং শাহজাদা আবদুল লতীফ সাহেবের বিষয়ে ছিল।

অনুরূপভাবে চাঁদার ব্যাপারেও তাঁর অনেক চিন্তা ছিল, যেন শুরুতেই তা আদায় হয়ে যায় এবং কোনো চাঁদা যেন বিলম্বিত না হয়। তিনি বলেন, একবার আমি চাঁদার অঙ্গীকার লিখিয়েছিলাম, কিন্তু টাকা ছিল না। এ নিয়ে খুব চিন্তিত ছিলাম। তখন আল্লাহ তা'লার কাছে দোয়া করলাম। আল্লাহ তা'লা অতি শীঘ্রই এর ব্যবস্থা করে দিলেন। তিনি বলেন, আমাদেরও উপদেশ দিতেন, নিয়মিত চাঁদা প্রদান করবে। তিনি সত্য স্বপ্ন দেখতেন। অন্যদের গোপন কথাগুলো সবসময় মনে রাখতেন। তাঁর স্বভাবে অন্যের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখার গুণ অনেক বেশি ছিল। অনুরূপভাবে তিনি বলেন, সত্য স্বপ্নের মধ্যে একটি স্বপ্ন এটিও যে, আমার নাম মাহমুদ ইফতেখার-তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে তাঁকে স্বপ্নে এই নাম দিয়েছিলেন। এরপর এই নাম রাখা হয়। তিনি লিখেছেন, তাঁর জীবনে অনেক কঠিন সমস্যা ও বিপদ এসেছিল, কিন্তু কখনো কোনো কষ্টের কথা প্রকাশ করেননি এবং সবসময় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতেন। শেষ অসুস্থতার সময়ও আমাদের খেয়াল রাখতেন। আমি যদি তাঁর জন্য হাসপাতালে বা বাড়িতে জেগে থাকতাম, তাহলে আমাকে বলতেন, তুমি ঘুমিয়ে পড়ো। আমি ঘুমিয়ে থাকলে নিজে আমাকে জাগাতেন না; বরং অপেক্ষা করতেন যে, আমি যখন জেগে উঠব, তখন আমাকে কোনো কাজের কথা বলবেন। তো তিনি এমনই ছিলেন।

এরপর ছেলে লেখেন, তিনি নিজের আনন্দ বিসর্জন দিয়ে অন্যদের আনন্দকে গুরুত্ব দিতেন এবং ওয়াকিফানে জিন্দেগির প্রতি অনেক সম্মান প্রদর্শন করতেন। অনুরূপভাবে তাঁর ছোট ছেলে, দ্বিতীয়জন হাশির, সে লেখে যে, সেও আগের ছেলের লেখা একই বিষয়গুলোর পুনরাবৃত্তি করছে-তিনি তাঁর নানির মতো উদার মনের অধিকারী ছিলেন এবং কখনো দরিদ্রদের জন্য অর্থ ব্যয় করতে কার্পণ্য করতেন না। তিনি আমাকেও বলতেন, যদিও তুমি নিয়মিত ওয়াকফে নেই, তবুও দ্বীনের সেবা করো। আর যখন আমি তাঁকে জানালাম যে, আমি জার্মানিতে সেবা করছি, তখন তিনি এতে খুব খুশি হয়েছিলেন।

আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার সঙ্গে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন, তাঁর মর্যাদা উচ্চ করুন।

তৃতীয় স্মৃতিচারণ মুকাররম রশীদ আহমদ আইয়াজ সাহেবের। তিনি সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার পেনশনার ছিলেন। গত কয়েক দিন আগে ৮৬ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ। আল্লাহ তা'লা-এর অনুগ্রহে তিনি ওসিয়তকারী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত স্বজনদের মধ্যে স্ত্রী ছাড়াও দুই কন্যা ও চার পুত্র রয়েছেন। তাঁর এক ছেলে তাহের আহমদ জাফর সাহেব জামাতের মুরব্বি এবং জামেয়াতুল মুবাশশিরীন ঘানার ভাইস প্রিন্সিপাল। নিজের দায়িত্বের কারণে, কর্মক্ষেত্রে অবস্থান করার কারণে তিনি তাঁর পিতার জানাযায় শরিক হতে পারেননি। আল্লাহ তা'লা তাঁকেও ধৈর্য ও সাহস দান করুন। এই মুরব্বি সাহেবই লিখেছেন, আমাদের পরিবারে আহমদীয়াতের প্রবেশ হয়েছিল আমাদের প্রপিতামহ মুকাররম মিয়াঁ আল্লাহ দিত্তা সাহেব মরহুম আবসার চুরের মাধ্যমে এবং এরপর তাঁর পরিবারে আহমদীয়াত বিস্তার লাভ করে। রশীদ আইয়াজ সাহেব আহমদীয়া জামা'তের বিভিন্ন বিভাগে সেবা করে গেছেন এবং এরপর অবসর গ্রহণের পরও বিভিন্ন কাজ করেছেন। তিনি বলেন, তিনি নিয়মিত নফল নামাজ আদায় করতেন, নামাজের ব্যাপারে নিয়মিত ছিলেন। অত্যন্ত বেশি পরিমাণে জিকির-আযকার করতেন। অনেক বেশি দোয়া করতেন। খেলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা পোষণকারী মানুষ ছিলেন। নিয়মিত কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন। চাঁদা প্রদানের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত নিয়মিত ছিলেন এবং এর পূর্ণ রেকর্ড রাখতেন। তিনি যখন ওসিয়তকারী ছিলেন, তখন নিজের জীবদ্দশাতেই (হিসসায়ে জায়েদাদ) সম্পত্তির অংশও পরিশোধ করে দিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'লা তাঁর সঙ্গে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন।

২ পাতার পর.....

দ্বিতীয়ত, নিজের কানকে পরনারীদের কণ্ঠস্বর শোনা থেকে রক্ষা করো। পরনারীদের কাহিনি শুনবে না।

তৃতীয়ত, এমন সব অনুষ্ঠান ও উপলক্ষ থেকে নিজেকে দূরে রাখো, যেখানে অসৎ কাজ সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

পঞ্চমত, যুবকদের জন্য নির্দেশ হলো, বিবাহ ও বিয়ের ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা থাকলে তারা যেন রোজা রাখে।

এরপর আরেকটি মন্দ কাজ হলো বিশৃঙ্খলা, পাপাচার ও অনাচার।

হজরত মসীহে মওউদ (আ.) বলেন, "যেখানে এমন কোনো সমাবেশ দেখতে পাবে, যেখানে পাপাচার ও অনাচার হচ্ছে, সেখান থেকে উঠে চলে যাবে।"

সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতেও তিনি নিষেধ করেছেন।

তিনি অত্যাচার থেকে বিরত থাকার উপদেশও দিয়েছেন।

এরপর হজরত মসীহে মওউদ (আ.) ফরজ নামাজের পাশাপাশি তাহাজ্জুদ ও নফল নামাজ আদায়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন।

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, "আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নিকটবর্তী হতে থাকে, এমনকি আমি তাকে ভালোবাসতে শুরু করি।"

অনুরূপভাবে, তিনি তাসবিহ ও তাহমিদের প্রতিও উৎসাহিত করেছেন।

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, "যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ আল্লাহ্র প্রশংসা ছাড়া শুরু করা হয়, তা বরকতহীন হয়।"

একইভাবে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রতিও বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

দরুদ শরিফকে নিজেদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ করে নাও। মহানবী (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরুদ পাঠ করে, আল্লাহ্তার প্রতি দশবার রহমত বর্ষণ করেন।"

অনুরূপভাবে, তওবা ও ইস্তিগফারের প্রতিও বিশেষ মনোযোগ দেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

মহানবী (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি নিয়মিত তওবা ও ইস্তিগফার করতে থাকবে, আল্লাহ্ তার জন্য প্রতিটি সংকট থেকে বেরিয়ে আসার পথ করে দেবেন, প্রতিটি দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দেবেন এবং এমন স্থান থেকে তাকে রিজিক দান করবেন, যেখান থেকে সে কল্পনাও করতে পারবে না।"

আল্লাহ্র সৃষ্টির সঙ্গে সদাচরণ করাও অত্যন্ত জরুরি।

হজরত মসীহে মওউদ (আ.) বলেন, "দেখো! যে জামাতের সদস্যরা একে অপরের অধিকার হরণ করে, সেই জামাত প্রকৃতপক্ষে কোনো জামাতই হতে পারে না। যখন চারজন একত্রে বসে, তখন তারা যেন তাদের দরিদ্র ভাইয়ের নিন্দা না করে, তার দোষত্রুটি খুঁজে না বেড়ায় এবং দুর্বল ও দরিদ্রদের প্রতি অবজ্ঞা ও ঘৃণার দৃষ্টিতে না তাকায়।"

হুজুরে আনওয়ার, আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আযীয বলেন, আমি কয়েকটি বিষয় বর্ণনা করেছি।

আমরা যদি নিজেদের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন সাধন করে, বাইআতের যথার্থ অধিকার আদায়ের উদ্দেশ্যে বাইআতের এই শর্তগুলো সম্পূর্ণরূপে পালন করি, তাহলে আমরা শুধু নিজেদের মধ্যে একটি পবিত্র সমাজই গড়ে তুলব না, বরং ইসলামের প্রকৃত বাণীও পৃথিবীতে প্রচার করতে সক্ষম হব। মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে, এমনকি নাস্তিক এবং ইসলামের বিরোধিতাকারীদের মধ্যেও এমন শিক্ষা প্রচার করতে পারব, যা একদিন তাদের অবশ্যই এ বিষয়ে চিন্তা করতে বাধ্য করবে যে, আহমদীরাই সেই মানুষ, যারা পৃথিবীতে আল্লাহ্র শাসন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি উচ্চ নৈতিক মূল্যবোধও গড়ে তুলতে চায়।

বর্তমানে দাজ্জালি শক্তিগুলো পৃথিবী থেকে আল্লাহ্র নাম মুছে ফেলার এবং বিশ্বে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে বাইআতের অধিকার আদায় করে, জিহাদ করে, আল্লাহ্?র কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করে এবং তাদের দাজ্জালি ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে প্রচেষ্টা চালানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

আল্লাহ্তা'লা আমাদের এ কাজ করার তৌফিক দান করুন।

দোয়ার মধ্যে সমগ্র পৃথিবীর শান্তি ও নিরাপত্তা এবং মুসলমানদের অস্তিত্ব ও নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করো। আল্লাহ্ করুন, প্রত্যেক আহমদী যেন পৃথিবীতে এক আল্লাহ্র শাসন প্রতিষ্ঠা এবং শান্তি ও নিরাপত্তা বিস্তারে নিজ নিজ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়।

এরপর হুজুরে আনওয়ার, আইয়াদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আযীয দোয়া পরিচালনা করেন।

পরিশেষে হুজুরে আনওয়ার বলেন, এ সময় উপস্থিতির যে প্রতিবেদন পাওয়া গেছে, তা অনুসারে আল্লাহ্?তা'লার অনুগ্রহে ৫১,১৮১ জন মানুষ জলসায় উপস্থিত হয়ে জলসার কার্যক্রম শুনছেন।

এই জলসায় ১১৭টি দেশের মানুষ অংশগ্রহণ করেছেন।

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir